ষোল-আনি

শ্রীজলধর সেন

বসন্ত-পঞ্চমী—১৩২৭

মূল্য দেড় টাকা।

প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

&
SONS

মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।
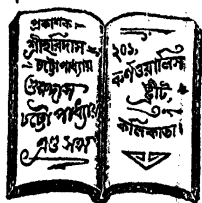
ষোল-আনি

[১]

গোরাচাঁদ আর কালাচাঁদ দুই ভাই। তাহারা সহোদর নহে, —সম্বন্ধ অতি দূর। সেকালে এমন দূর-সম্পর্কীয় ব্যক্তিও আপন হইয়া যাইত। গোরাচাঁদের পিতার এক মাসতুতো ভাই বড়ই দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার সংসারে একমাত্র স্ত্রী ছিলেন, আর কেহই ছিল না। একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াই এই মাসতুতো ভাইয়ের স্ত্রী যখন মারা যান, তখন গোরাচাঁদের পিতা এই মাতৃহীন শিশুটীর লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন। ছেলেটীর রং বড়ই কালো বলিয়া গোরাচাঁদের পিতা নিজপুত্র গোরাচাঁদের নামের সঙ্গে মিল করিয়া এই ছেলেটীর নাম রাখেন কালাচাঁদ।

গোরাচাঁদ আর কালাচাঁদ সহোদরের মতই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা প্রকৃত সংবাদ জানিতেন না, তাঁহারা মনে করিতেন, ইঁহারা সহোদর ভ্রাতা। কিন্তু দুই ভাইয়ের প্রকৃতি এমন বিভিন্ন ছিল যে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই বলিতে পারিতেন, এক পিতার ঔরসে, এক মায়ের গর্ভে এমন বিরুদ্ধ স্বভাবের দুই ভাই

জন্মগ্রহণই করিতে পারে না। গোরাচাঁদ সর্ব্ববিষয়েই গোরাচাঁদ, আর কালাচাঁদ ভিতর-বাহিরেই কালাচাঁদ।

ইঁহাদের উপাধি মুখোপাধ্যায়,—মহা কুলীন, ফুলের মুখুটী, বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। বাড়ী সুবর্ণপুর। অবস্থা তেমন মন্দই বা কি? জমাজমি যাহা আছে, তাহাতে বেশ চলিয়া যায় এবং দুপয়সা সঞ্চয়ও হয়। তাহার পর কালাচাঁদ মুখুয্যে যেমন-তেমন লোক নহে; যেখানে সূচ প্রবেশের পথও লোকে দেখিতে পায় না, কালু মুখুয্যে সেখানে হাতী চালাইতে পারে। বড় ভাই গোরাচাঁদ অতি কোমল-প্রকৃতি, সদাশয় ব্যক্তি। তিনি গ্রামের বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ফেল করিয়াই পড়াশুনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন তিনিই বিষয়-কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিতেন, গোরাচাঁদকে কিছুই দেখিতে হইত না। পিতা যখন পরলোকগত হইলেন, তখন কালাচাঁদের বয়স কুড়ি বৎসর; কিন্তু সেই বয়সেই তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা এমন পরিপক্ক হইয়াছিল যে, গোরাচাঁদ আর বিষয়-কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলেন না, কালাচাঁদের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সেই বয়সেই অর্থাৎ ২৬ বৎসর বয়সেই ধর্ম্মকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি থান-দান, পূজার্চ্চনা করেন, গ্রামের দশজনের সুখ-দুঃখের সময় উপস্থিত হন এবং যথাসাধ্য সকলের সাহায্য করেন। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত।

কালাচাঁদ কিন্তু গোরাচাঁদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল; দয়াধর্ম্ম তাহার ছিল না। যাহাতে দুপয়সা প্রাপ্তি হয়, এই চিন্তাতেই

সে নিবিষ্ট থাকিত। এতদ্ব্যতীত তাহার স্বভাব-চরিত্রও তেমন, ভাল ছিল না।

গোরাচাঁদ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, কালাচাঁদ তাঁহার দূর-সম্পর্কের ভাই—বলিতে গেলে কেহই নহে; কিন্তু তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, কালাচাঁদকে যখন তিনি পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন এবং তাহার যখন আর কেহই নাই, তখন গোরাচাঁদ যেন তাহাকে কিছুতেই পরিত্যাগ না করে; নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে করে। গোরাচাঁদ তাহাই করিয়াছেন, কালাচাঁদের উপরেই সমস্ত ভার দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত। কালাচাঁদ কাজকর্ম্মে খুব উপযুক্ত; এ অবস্থায় তাহার চরিত্র-দোষ এবং অন্যবিধ অত্যাচারের কথা শুনিয়াও গোরাচাঁদ মুখ ফুটিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারিতেন না—শাসন করা ত দূরের কথা।

বাড়ীতে স্ত্রীলোকের মধ্যে দুই ভাইয়ের স্ত্রী; গোরাচাঁদের মাতাঠাকুরাণী অনেক দিন হইল, পিতার পরলোক গমনের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। গোরাচাঁদের স্ত্রী পরমা সুন্দরী ছিলেন; তাঁহার পিতৃকুলে কেহই ছিল না। একটী কন্যা ব্যতীত তাঁহার আর সন্তানও হয় নাই।

গোরাচাঁদ যেমন মানুষ ছিলেন, তাঁহার স্ত্রীও তেমনই লক্ষ্মী-স্বরূপিনী; কিন্তু কালাচাঁদের স্ত্রীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল। কালাচাঁদ নিজেও কালাচাঁদ, তাহার অদৃষ্টে প্রজাপতি মিলাইয়া দিয়াছিলেনও তেমনই অর্দ্ধাঙ্গিনী। শুনিতে পাওয়া যায়, সম্পন্ন

গৃহস্থের একমাত্র কন্যা দেখিয়া গোরাচাঁদের পিতা কালাচাঁদের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়াই কুৎসিত মেয়েটীকে কালাচাঁদের অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া দিয়াছিলেন। দেখিতে কুৎসিত হইলেও কালাচাঁদের স্ত্রী বড় ভাল মেয়ে। স্বামী যে তাহাকে দুইচক্ষে দেখিতে পারিত না, কোন দিন ভাল মুখে একটী কথাও বলিত না, সর্ব্বদা দূর দূর করিত, তাহাতেও কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যাকে কেহ বিচলিত দেখে নাই। ছোটবধূ মন্দাকিনী বড় যায়ের মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার স্নেহ-আদরের অধিকারিণী হইয়া স্বামীর অনাদর নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিতেন। বড়-যা মানদা তাঁহার স্নেহের অঞ্চল দিয়া এই অভাগিনী ছোট-যাকে ঢাকিয়া রাখিতেন। দেবর স্বামীর ছয় বৎসরের ছোট হইলেও মানদা কোন দিন তাহার সহিত কথা বলিতেন না। সাধারণতঃ, দেবরের সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যে প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, পরস্পরের মধ্যে যে প্রকার সম্বন্ধ প্রায় সকল গৃহস্থের বাড়ীতেই দেখিতে পাওয়া যায়, মানদা সে রকম ভাবে দেবরের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন না। তিনি দেবরকে যে ঘৃণা করিতেন তাহা নহে; কিন্তু কালাচাঁদের ব্যবহার তাঁহার নিকট ভাল বোধ হইত না। এই কারণে তিনি তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন না। কালাচাঁদ অনেক সময়ে এ জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিত, রাগ করিত, অনেক ঠাট্টা-তামাসাও করিত; কিন্তু মানদা তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না। দুই যায়ে সংসারের কাজকর্ম্ম করিতেন, একমাত্র কন্যা সুহারের লালন-পালন করিতেন।

কালাচাঁদের একটা গুণ ছিল; সে নানা উপায়ে অর্থ

উপার্জ্জন করিত, ন্যায় অন্যায় অবিচার অত্যাচার করিয়া টাকা সংগ্রহ করিত; টাকার জন্য কাহারও প্রাণনাশ করিতেও হয় ত দ্বিধা বোধ করিত না; ব্যয়ের বেলায় কিন্তু সে ভারি হিসাবী ছিল। যাহাদের স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়, তাহারা অপব্যয়ী হইয়া থাকে; তাহাদের হাতে বিষয় বা টাকাকড়ি পড়িলে তাহারা দুইদিনেই উড়াইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। কালাচাঁদ কিন্তু সে রকমের মানুষ ছিল না। তাহার স্বভাব অতি মন্দ ছিল; কিন্তু সে ব্যাপারেও সে মুক্তহস্ত ছিল না; সে বিশেষ হিসাব করিয়াই অপব্যয় করিত। তাহার রোজগারের অনুপাতে সে ব্যয় অতি সামান্য বলিলেই হয়। সংসার-খরচের দিকেও তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল; কোন প্রকারে দুপয়সা বেশী খরচ হইবার যো ছিল না। অথচ কাহার জন্য যে সে জোতজমা বৃদ্ধি করিতেছিল, অর্থ সঞ্চয় করিতেছিল, লগ্নী কারবারে একেবারে পিশাচের ন্যায় ব্যবহার করিত, কাহাকেও একটী পয়সা রেহাই দিত না, তাহা বুঝিয়া উঠা যাইত না। স্ত্রীর সহিত তাহার মুখ-দেখাদেখিও ছিল না; সে রাত্রিতে বাড়ীতেই থাকিত না। সংসারের অবলম্বন একমাত্র তাহার দাদার মেয়েটী। তাহাকেও সে তেমন আদর-যত্ন করিত না; তাহার জন্যও কখন কোন দ্রব্য কিনিয়া দিত না। তবুও যে কেন সে এমন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহা সেই জানে। গোরাচাঁদ যদি কখন কোন বিষয়ে কিছু বলিতেন, তাহা হইলে কালাচাঁদ অতি গম্ভীর ভাবে বলিত, "সময় অসময় আছে দাদা! চারিদিকে দেখে-শুনে খরচ করতে হয়। দু-দশ টাকা হাতে না

থাকলে কি মান-সম্ভ্রম রক্ষা করে চলা যায়, না দশজনে মানে চেনে।" গোরাচাঁদ আর দ্বিরুক্তি করিতেন না।

এই ভাবেই কয়েক বৎসর গেল। তাহার পরই এই মুখোপাধ্যায় পরিবারে এক অভাবনীয় পৈশাচিক দৃশ্যের অভিনয় হইল। সেই কথা বলিবার জন্যই তাঁহাদের পরিবারের এই পরিচয়টুকু দিতে হইল।

[২]

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার ছয়মাস পূর্ব্বে গোরা-চাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় মাসাধিক কাল জ্বরে ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার কন্যা সুহারের বয়স তখন বার বৎসর। মানদার এতদিন যখন সামান্য যাহা প্রয়োজন হইত, গোরাচাঁদকে বলিলেই তাহা পূর্ণ হইত; এখন দুইটী পয়সার প্রয়োজন হইলেই কালাচাঁদের কাছে দরবার করিতে হয়। তিনি কালাচাঁদের সহিত কথা বলিতেন না; সুহারের দ্বারাই কালাচাঁদের কাছে অভাবের কথা জানাইতে হইত। কালাচাঁদ ইহাতে বড়ই বিরক্ত হইত; বলিত, "কেন? তোর মায়ের মুখ নেই, সে কি বোবা; যখন যা দরকার হয়, আমার কাছে নিজে চাইলেই পারে। তোর মা নিজে মুখে না চাইলে আমি কোন কথা শুনব না।" এই কারণে সুহারও তাহার কাকার কাছে কিছু বলিতে চাহিত না; তাহার মাকে বলিত "মা, তুমি কাকার সঙ্গে কথা বল্লেই পার? তা হ'লে ত কাকা এমন রাগ করতে পারবেন না।"

মানদা বলিতেন; "না মা, তিনি বেঁচে থাক্‌তে এতকাল যখন ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা বলি নাই, তাঁকে দেখে লজ্জা করে এসেছি, এখন কি আর কথা বলা যায়। যাক্, আমার আর কয় দিনই বা ভিক্ষা করতে হবে। কোন রকমে তোকে পার করতে

পারলেই হয়; তারপর আর আমার কিছুরই দরকার হবে না।"

এদিকে কালাচাঁদও যেন একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। সে যখন-তখনই বাড়ীর মধ্যে আসিয়া "বড় বৌ, এটা দেও, ওটা দেও" বলিয়া মানদাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে; ঠাট্টা-তামাসার মাত্রাও যেন ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। মানদার বয়স তখনও বেশী হয় নাই; পনর বৎসর বয়সে সুহার জন্মগ্রহণ করে; সুহারের বয়স এখন বার বৎসর; সুতরাং মানদা সাতাশ বৎসরের যুবতী। তাঁহার শরীরেও কোন রোগ ছিল না।

কালাচাঁদ এতদিন বাহিরেই বেশী থাকিত; বিশেষ প্রয়োজন না হইলে বাড়ীর মধ্যে আসিত না; এবং যখন যাহা চাহিত, মানদা মন্দাকিনীর দ্বারাই তাহা যোগাইয়া দিতেন, নিজে বড়-একটা সম্মুখে যাইতেন না। ইহাতে মন্দাকিনীকে সর্ব্বদাই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত, স্বামীর কটূক্তি শুনিতে হইত; কিন্তু বড়-দিদির কথা তিনি কিছুতেই অমান্য করিতে পারিতেন না, কাজেই সমস্ত তিরস্কার, অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত।

দিন কয়েক পূর্ব্বে কালাচাঁদের নিকট পত্র আসিল যে, তাহার শাশুড়ী অত্যন্ত পীড়িতা, বাঁচিবার আশা নাই; মন্দাকিনীকে তাঁহারা একবার লইয়া যাইতে চান। কালাচাঁদের তাহাতে কোন দিনই আপত্তি ছিল না—ও-পাপ বিদায় হইলেই সে বাঁচে। পূর্ব্বেও অনেকবার মন্দাকিনী পিত্রালয়ে গিয়াছেন; কিন্তু দুইমাস যাইতে না যাইতেই গোরাচাঁদ নিজে যাইয়া ভাদ্রবধূকে বাড়ী লইয়া আসিতেন;

মন্দাকিনীর পিতা মাতা আপত্তি করিতে পারিতেন না। এবার শাশুড়ীর পীড়ার সংবাদ পাইয়া কালাচাঁদ শ্বশুর-বাড়ীতে পত্র লিখিয়া দিয়াছিল যে, তাঁহাদের যখন ইচ্ছা, তখনই মন্দাকিনীকে লইয়া যাইতে পারেন; তাহার কোনই আপত্তি নাই। এই পত্র পাইয়াই মন্দাকিনীর পিতা কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। মানদা মন্দাকিনীকে বারবার বলিয়া দিলেন যে, মাকে একটু সুস্থ দেখিলেই সে যেন চলিয়া আসে—"দেখ্‌ছ ত ভাই, আমি একেলা মানুষ, কথা বল্‌বার লোকটী নেই। তুই না থাক্‌লে আমার বড়ই কষ্ট হবে। এতদিন তবুও তিনি বেঁচে ছিলেন। এখন যে আমার সব দিক্ অন্ধকার। তুই থাক্‌লে কথায়-বার্ত্তায় কাজে-কর্ম্মে দিনগুলো কেটে যায়। দেখিস্ ভাই, বেশী বিলম্ব করিস না।" মন্দাকিনী মানদার পদধূলি লইয়া বলিল "না দিদি, তোমাকে এমন একেলা ফেলে কি আমি সেখানে থাক্‌তে পারি; মাকে একটু ভাল দেখ্‌লেই আমি চলে আস্‌ব।"

[৩]

সেদিন একাদশী। কালু মুখুয্যের বাড়ীর পাশেই তাহাদের জ্ঞাতি চণ্ডী মুখুয্যের বাড়ী। চণ্ডী বাবুর অবস্থা পূর্ব্বে তেমন ভাল ছিল না। তাঁহার পিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা রমাসুন্দরীর দেবগ্রামের জমিদার হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ দেন এবং তদুপ-লক্ষে কিছু জমিজমা ও নগদ টাকা পান। চণ্ডী মুখুয্যের সেই জোত-জমার আয়েই চলে এবং যখন যা দরকার হয়, দেবগ্রামে দিদির নিকট চাইলেই তাহা পূর্ণ হয়। চণ্ডী বাবুর পর-পর ছয়টী মেয়ের পর এবার একটী পুত্র-সন্তান হইয়াছে। ছয় মেয়ের পর ছেলে, তাহার অন্নপ্রাশনে ঘটা না করিলে কি ভাল দেখায়। তাই তিনি অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার দিদিও এই শুভকর্ম্ম উপলক্ষে সুবর্ণপুরে আসিয়াছেন। জমিদার হরিপ্রসন্ন বাবুর মৃত্যু হইয়াছে; উপযুক্ত পুত্র সিদ্ধেশ্বর বাবুই এখন মালিক। মায়ের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বর বাবুও মাতুল-পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আসিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এই অন্নপ্রাশনের সমস্ত ব্যয়ভারই চণ্ডী বাবুর দিদি বহন করিয়াছেন। সঙ্গে লোকজন, দাস-দাসীও অনেক আসিয়াছে। এই একাদশীর দিনই অন্নপ্রাশন। গ্রামের ভদ্র ইতর সকল লোকই নিমন্ত্রিত হইয়াছে। কালাচাঁদের বাড়ীতে আজ আর উনানে হাঁড়ি চড়াইবারই প্রয়োজন হয় নাই। মানদার একাদশী; কালাচাঁদ ও-বাড়ীর ব্যাপারেই নিযুক্ত; সুহার

এবং চাকর-চাকরাণীরা সকলেই সেখানে নিমন্ত্রণ খাইয়াছে। লোক-জনের আহারাদি শেষ হইতে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া গিয়াছিল। কালাচাঁদ সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে আসিয়া পুনরায় স্নান করিয়া চণ্ডী বাবুর বাড়ীতে আহার করিতে গেল,—দিনমানে আর তাহার আহার হয় নাই।

রাত্রিতে কালাচাঁদ বাড়ীতে থাকিত না; তাহার রাত্রি-বাসের অন্য স্থান ছিল। বাড়ীতে বৃদ্ধা দাসী গোপালের মা রাত্রিতে মানদার ঘরের বারান্দায় শয়ন করিত; বাহিরে বৈঠকখানায় দুইজন চাকর থাকিত। মন্দাকিনীর ঘর এ কয়দিন বন্ধই আছে। মন্দাকিনী এখানে থাকিবার সময়েও রাত্রিতে মানদার ঘরেই তিনি শয়ন করিতেন।

একে বৈশাখ মাস, তাহাতে একাদশী। মানদা ক্লান্ত হইয়া তাঁহার ঘরের বারান্দায় একখানি মাদুর পাতিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। গোপালের মা অন্য দিন সেই বারান্দার অপর পাশেই শয়ন করিত। সে দিন মানদাকে বারান্দায় শয়ন করিতে দেখিয়া সে মন্দাকিনীর ঘরের বারান্দায় সুহারকে লইয়া শয়ন করিয়া তাহাকে নানা গল্প শুনাইতেছিল; তখনও তাহাদের নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই।

রাত্রি তখন সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। কালাচাঁদ চণ্ডী বাবুর বাড়ীতে আহার শেষ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোপালের মা ও সুহার তখনও জাগিয়া ছিল। কালাচাঁদকে আসিতে দেখিয়া তাহারা গল্প বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

কালাচাঁদ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া মানদার ঘরের বারান্দায় উঠিয়া ডাকিল "বড়বৌ, একবার ওঠ ত।"

কালাচাঁদের আহ্বান শুনিয়াই মানদা বস্ত্রাদি সংযত করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া প'ড়লেন।

কালাচাঁদ বলিল "বড়বৌ, কাল যে তোমার কাছে একটা কাগজের বাণ্ডিল রেখেছিলাম, সেইটা বের করে দাও ত। এখনই দরকার।"

মানদার ঘরের মধ্যে আলো ছিল না। তিনি আলো জ্বালিবারও প্রয়োজন বোধ করিলেন না, কারণ সেই কাগজের বাণ্ডিলটা তিনি বাহিরে তাকের উপরই রাখিয়াছিলেন। অন্ধকারেই তাহা আনিয়া দিতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিতে না ক'রতেই কালাচাঁদ সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। বোধ হয় এক মিনিটও অতীত হয় নাই—মানদা ঘরের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে ভীষণ চীৎকার!

সেই চীৎকার শুনিয়াই গোপালের মা ও সুহার তাড়াতাড়ি উঠানে নামিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেখিল মানদার ঘরের দ্বার বন্ধ এবং ভিতরে কেমন যেন "গোঁ গোঁ" শব্দ হইতেছে। সুহার কাঁদিয়া উঠিল; গোপালের মা চীৎকার করিতে করিতে পাশের বাড়ীর দিকে দৌড়িল "ওগো, তোমরা এসো গো! সর্ব্বনাশ হোলো! ছোট বাবু বড়-মাকে মেরে ফেলছে গো!"

চণ্ডী বাবুর বাড়ী তখন আত্মীয়-কুটুম্বে পূর্ণ। গোপালের মায়ের

চীৎকার এবং সুহারের ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া স্ত্রীপুরুষ যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, ঊর্দ্ধশ্বাসে এ-বাড়ীতে আসিয়া পড়িলেন। সকলের মুখেই "কি হয়েছে? ব্যাপার কি?" শব্দ।

গোপালের মা চীৎকার করিয়া বলিল "ওগো, শীগ্‌গির বড় মায়ের ঘরের দোর ভেঙ্গে ফেল! হায় হায়, ছোটবাবু বুঝি তাকে মেরে ফেল্‌লে গো।"

তখন চণ্ডী বাবু ও আরও দুই তিনজন একসঙ্গে মানদার ঘরের বারান্দায় উঠিয়া দেখেন দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। ঘরের মধ্যে কি যেন একটা 'গোঁ গোঁ' শব্দ হইতেছে। আর বিলম্ব না করিয়া তাঁহারা দুয়ারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন। চার পাঁচ আঘাতেই দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেল। ঘর অন্ধকার! মেজের এক কোণ হইতে কেবল একটা কাতরোক্তি শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। একজনের হাতে একটা দিয়াশলাই ছিল; সে একটা কাঠি জ্বালিতেই ঘরের মধ্যের অন্ধকার দূর হইল। সকলে সভয়ে দেখিল, মানদা ঘরের মেজের উপর পড়িয়া আছেন। তাঁহারই কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত কাতরোক্তি বাহির হইতেছে। ঘরের চারিদিকে দেখিবার পূর্ব্বেই দিয়াশলাই নিবিয়া গেল। চণ্ডী বাবু বলিলেন "খবরদার, তোমরা দোর আগ্‌লে দাঁড়াও, পাজিটা যেন পালাতে না পারে। আর একটা দিয়াশলাই জ্বাল।"

আর দিয়াসলাই জ্বালিতে হইল না; চণ্ডী বাবুর বাড়ী হইতে তিন-চারিটা লণ্ঠন আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণ তখন লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

চণ্ডী বাবু তখন চীৎকার করিয়া বলিলেন "ওগো, তোমরা মেয়েরা কে এসেছ, শীগ্‌গির ঘরের মধ্যে এস। বড়-বৌ যে কেমন করছেন?"

এই কথা শুনিয়াই চণ্ডী বাবুর দিদি অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই দ্বারের নিকট যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

কালাচাঁদ তখন দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। সে মনে করিল, এই তাহার পলায়নের সুযোগ; সে ঘরের অন্য যে দ্বার ছিল, তাহা খুলিবার উপায় ছিল না। সে তখন রমাসুন্দরীকে এক ধাক্কা দিয়া বারান্দায় আসিয়া পড়িল। সকলেই সতর্ক ছিল—তাহার আর পলায়নের পথ হইল না। একজন তাহাকে এমন এক ধাক্কা দিল যে, সে বারান্দা হইতে একেবারে নীচের উঠানে পড়িয়া গেল। তিনচারি জন আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল; দু-চারটী উত্তম-মধ্যমও হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বর বাবু বাহিরে উঠানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন "আহা মেরো না গো! যাতে পালাতে না পারে, তাই কর। কোন অত্যাচার কোরো না।"

চণ্ডী বাবু তখন বারান্দা হইতে নামিতে নামিতে বলিলেন "ঘরের মধ্যে আর গোল করে কাজ নাই। মেয়েরাই যা হয় করবেন। তোমরা নেমে এস।"

প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখেন, পাড়ার অনেক লোক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। চণ্ডী বাবু বলিলেন "আর এখানে গোল করে কাজ

নেই; আমার ওখানে যাওয়া যাক্। সেখানে গিয়ে যা কর্ত্তব্য তা স্থির করা যাবে।" চাকরদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "ওরে, তোরা তিন চারজন এখানে থাক, দিদি যা বলেন তাই করিস।"

রমাসুন্দরী ঘরের মধ্যে হইতেই বলিলেন "কোন ভয় নেই, জ্ঞান হয়েছে। ডাক্তার ডাকতে হবে না। তোমরা বাড়ীতে যাও।"

একজন বলিল "ওরে, হারামজাদা যেন পালিয়ে যেতে না পারে।" এই বলিয়া কালাচাঁদকে পদাঘাত করিল। কালাচাঁদের মুখে আর কথা নাই; সে চোরের মত মার খাইতে লাগিল। যে মারিতে নিষেধ করে, সেও কিন্তু দুই-ঘা দিয়া পথ দেখায়।

[8]

কালাচাঁদকে লইয়া সকলে চণ্ডী বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বৈঠক বসিল; পাড়ার মাতব্বরেরা সকলেই ছিলেন; যুবকেরাও উপস্থিত। তখন কথা উঠিল, কর্ত্তব্য কি? কালাচাঁদ যে পাপ কার্য্য করিয়াছে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "যা হবার তা হয়ে গিয়েছে; এখন আর সে কথা নিয়ে আন্দোলন করে কি লাভ হবে। অধিক লোক-জানাজানি করে সুধু কলঙ্ক বাড়ানো। এখন চেপে যাওয়াই কর্ত্তব্য। এতবড় সম্মানী ঘর, মুখুয্যেদের দেশজোড়া নাম; লোক-জানাজানি করে সেই বংশের কলঙ্ক প্রচার করা কিছুতেই উচিত হবে না! তাতে তোমাদেরই একঘরে হতে হবে। ওই গোরাচাঁদের মেয়েটী রয়েছে; তার বিবাহই হবে না। এমন কলঙ্কের কথা রাষ্ট্র হলে কি তোমাদের ঘরের মেয়ে নিতে কেউ সম্মত হবে? এখন চেপে যেতেই হবে। এই হতভাগাটা দশ ব্রাহ্মণের পা ছুঁয়ে দিব্বি করুক যে, এমন কর্ম্ম আর করবে না—"

কে একজন বলিয়া উঠিল "আর একশ হাত মেপে নাকে খত দিতে হবে।"

একটী যুবক বলিলেন "কালাচাঁদ মুখুয্যের সঙ্গে কেউ কোন

সম্পর্ক রাখতে পারবে না—ওকে এক-ঘরে করতে হবে, আর ওর দুটো কাণ কেটে দিতে হবে; অমনি ছাড়া হবে না।"

আর একটী যুবক বলিলেন "ও কথাই নয়! ওকে আদালতে আসামী করে দিতে হবে। পাঁচ বছর জেল খাটাতে হবে। অমন লোককে সহজে ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই হবে না।"

চণ্ডী বাবু বলিলেন "আদালতে গেলে যে কলঙ্ক দেশ ছেয়ে যাবে। ওর না হয় পাঁচ বছর মেয়াদ হবে। কিন্তু তার পর? আমরা দশের কাছে মুখ দেখাব কেমন করে? না, না, ও সব হবে না। চক্রবর্ত্তী দাদা যা বললেন, তাই কর্ত্তব্য! চেপে যাওয়াই একমাত্র উপায়—আর পথ নেই!"

হরিশ গাঙ্গুলী এক পাশে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন; তিনি পাড়ার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। তিনি বলিলেন, "বলি, এমন কি হয়েছে যে, তোমরা একেবারে নবরত্নের সভা বসিয়ে ফেল্‌লে। সবই এখন থিয়েটারী কাণ্ড দেখ্‌ছি। কেন রে বাবু, ব্যাপার কি? এ যেন আর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও হয় না,—এই আমাদের গাঁয়েও যেন এমনটা কোন দিন হয় নাই। ছেলে মানুষ, বেটা ছেলে, করেছে না হয় একটা কাজ; তা নিয়ে এত চেঁচামেচি, এত গোলমাল কেন রে বাপু! বাবা রে, মা রে, গেলাম রে! এখন বসাও বৈঠক, কর বিচার! অমন কত যে হয়ে যাচ্ছে; অমনই বা বলি কেন,—ওর থেকেও গুরুতর কত কি হচ্ছে, তা দেখতে পাচ্ছ না, কাণে শুন্‌তে পাচ্ছ না। যত সব ছেলেমানুষী আর কি! এই আশি বৎসর বয়স হলো; আমার অজানা ত কিছুই

নেই। কৈ এতদিন ত অমন করে ঢাক-ঢোল বাজাও নেই। ঐ যে ও-বাড়ীর—"

চণ্ডী বাবু বাধা দিয়া বলিলেন "ঠাকুরদা, আর পরের কথা তুলে কি হবে? গোপনে ত অনেক চলে যাচ্ছে; তা আপনিও দেখছেন, আমরাও দেখছি। কি করব, দেখেও দেখিনে, শুনেও শুনিনে। কিন্তু সে সবই গোপনে চলছে। এটা যে বড়ই বেজে উঠল, তার কি উপায়?"

কেনারাম ভট্টাচার্য্য গ্রামের অনেকেরই পুরোহিত। তিনি এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন "এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধানই বলবৎ গণ্য করতে হবে। এ প্রকার কুকার্য্য যে অনুষ্ঠিত হয় না, এমন কথা উচ্চারণ করা সমীচীন হবে না। এ প্রকার ব্যাপার সংঘটিত হয়, কিন্তু অতি গোপনে। যে গৃহে এই শ্রেণীর পাপাচার হয়, সেই গৃহস্থই তাহা গোপন করিয়া ফেলেন; পল্লীর দুদশজনের তাহা শ্রুতিগোচর হইলেও তাহা জনশ্রুতি মাত্র; সুতরাং তাহা শাস্ত্রের অধিগম্য নহে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার ব্যত্যয় হইয়াছে। এই কুকার্য্যের সংবাদ কেবল গৃহস্থের গৃহের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রহিল না, গৃহান্তরেও গেল;—গৃহান্তরই বা বলি কেন, গ্রামান্তরের অনেক ভদ্রলোকও এই ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী হইলেন। সুতরাং গোপনে অনুষ্ঠিত কুকার্য্য বলিয়া ইহা গণ্যই হইতে পারে না। ইহা প্রকাশ্য ব্যভিচার। মাতৃসমা বিধবা ভ্রাতৃবধূর উপর তাঁহার অসম্মতিতে অত্যাচার। শাস্ত্রানুসারে ইহার দণ্ড কর্ত্তব্য। এ বিষয় লইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইবার

প্রয়োজনাভাব ; আমাদের শাস্ত্রের অনুশাসনই প্রযুক্ত। শাস্ত্রের বিধান এই যে, কালাচাঁদ বাবাজিকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, নতুবা তাহাকে পতিত হইতে হইবে। সে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে গৃহীত হউক ; তাহার দ্বিচারিণী ভ্রাতৃবধূকে গৃহ-ত্যাগ করিয়া যথা-ইচ্ছা গমন করিতে হইবে ; আমাদের সমাজে তাহার স্থান হইবে না ; —যে বিধবার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে, তাহার স্থান আমাদের পবিত্র হিন্দুসমাজে নাই। শাস্ত্রের এই সর্বজন-বিদিত ব্যবস্থা অনুসারে কার্য্য করা ব্যতীত গত্যন্তর দৃষ্ট হইতেছে না। এ কার্য্য গোপন করিলে চলিবে না ; অন্ততঃ কেনারাম ভট্টাচার্য্য জীবিতমানে এমন কার্য্য হইতে পারিবে না।”

রমাসুন্দরী একটু পূর্ব্বেই কালাচাঁদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি এই গ্রামেরই মেয়ে ; তাহার পর তাঁহার বয়সও পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং চণ্ডী বাবুর বৈঠক-খানায় যাঁহারা আলোচনা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সম্মুখে উপ-স্থিত হইবার তাঁহার বাধা বা লজ্জার কারণ ছিল না। তিনি চুপ করিয়া কেনারাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সাধুভাষায় বিবৃত শাস্ত্রের বিধান শ্রবণ করিতেছিলেন।

ভট্টাচার্য্য যখন তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন, তখন অন্যের কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন “কেনারাম, তোমাদের সুবর্ণপুরে যে নূতন শাস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, এ সংবাদ ত জানি পাই নাই।”

কেনারাম বলিলেন “নূতন শাস্ত্র কি দিদি! যে শাস্ত্র আবহমান

কাল এই হিন্দুসমাজের কর্ত্তব্য বিধান করিতেছে, আমি সেই শাস্ত্রের কথাই উল্লেখ করিলাম।"

"কৈ, তুমি ত ভাই প্রমাণ কিছুই দিলে না,—দুই দশটা বচনও আওড়ালে না। বচন-প্রমাণ না দেখালে কি আমাদের মত মূর্খ মেয়েমানুষ শাস্ত্র বুঝতে পারে?"

কেনারাম বলিলেন "এ সকল ত অতি সহজ ব্যাপার; ইহার জন্য আর প্রমাণ-প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় না।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "কেনারাম, ভাই, কিছু মনে করো না; আমি জিজ্ঞাসা করি, গোপনে কোন কুকার্য্য করলে তাতে পাপ হয় না?"

"পাপ হবে না কেন? কিন্তু এ যে কলিকাল দিদি! এখন কি আর সেই সত্যযুগের ব্যবস্থা খাটে? তাই এখন অনেকটা অন্তরাল করিয়া চলিতে হয়। কুকার্য্যকারী সকলকেই যদি দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে কি সমাজ তিষ্ঠিতে পারে। সেই কারণে, যে যাহা অনুষ্ঠান করে, তাহা উপেক্ষা করিতে হয়, নতুবা সমাজের স্থিতি রক্ষা হইবে কি প্রকারে?"

"তা হলে তুমি বলতে চাও যে, যার যা ইচ্ছা, যেমন কুকার্য্য ইচ্ছা, তাই সে করুক; তবে যেন সাবধানে করে, গোপনে করে; তা হলে তোমরা তাদের সমাজে চালিয়ে নিতে পার। এই তোমাদের এখানকার শাস্ত্রের বিধান, কেমন?"

"না দিদি, তা ঠিক নয়। তবে এই—এই কথাটা—এই কি জান—"

কেনারামের কথায় বাধা দিয়া রমাসুন্দরী বলিলেন—"কথাটা এই যে, তোমরা শক্তের কাছে নরম, আর নরমের কাছে শক্ত। যাক্ সে কথা। তুমি যে বল্‌লে, কালাচাঁদ একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই তাকে তোমরা সমাজে তুলে নিতে পার। তার এই ঘোরতর পাপের ঐ সামান্য শাস্তিই তোমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে। আর মানদার বেলায় তোমরা ব্যবস্থা করলে যে, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাক। তোমরা তাকে সমাজে কিছুতেই স্থান দিতে পারবে না। কেমন, এই ত তোমার ব্যবস্থা ?"

কেনারাম বলিলেন "শাস্ত্রের বিধানই এই। ত্রিকালজ্ঞ মুনি-ঋষিরা যা ব্যবস্থা করে গিয়েছেন, অল্পবুদ্ধি আমরা কি তার অন্যথা করতে পারি, না তার তাৎপর্য্য গ্রহণ করতে পারি।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "দেখ কেনারাম, আমিও ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমিও শাস্ত্রের বিধান মানি। কিন্তু যে শাস্ত্র কালাচাঁদের মত মানুষের জন্য অতি সামান্য, অতি হাস্যকর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতে পারে, আর মানদাকে পথের ভিখারিণী করতে পারে, সে শাস্ত্র মুনিঋষিরা করেন নাই, করতে পারেন না, এ কথা আমি জোর করে বল্‌ছি। যদি তুমি কোন শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিতে পার, তা হলে আমি তোমার মুখের উপর বলব যে, সে শাস্ত্র তোমার এই কালাচাঁদের মত মুনিঋষিরাই করেছেন ; তা হিন্দুর শাস্ত্র নয়,—প্রকৃত মানুষের শাস্ত্র নয়। অপরাধ করল কালাচাঁদ, মহাপাপ করল কালাচাঁদ, আর তার ফলভোগ করবে সেই অনাথা বিধবা! একবার গিয়ে দেখে এস

মানদার অবস্থা, শুনে এস তার কান্না! পাষাণও গলে যায় কেনারাম; পাষাণও গলে যায়! তার অপরাধ কি? বল না তোমরা সকলেই ত এখানে আছ, বল না মানদার কি অপরাধ, যে তাকে পথে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করতে চাও। এই নরপশুটা তাকে আক্রমণ করল; সে নিরুপায়া অবলা; সে কি করবে? প্রাণপণে চীৎকার করা ছাড়া আর কি উপায় তার ছিল, বল না তোমরা? তারপর, তোমরা কি না এখানে বৈঠক করে কালা-চাঁদকে ধুয়ে-মুছে ঘরে তুলতে যাচ্ছ, আর মানদাকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিতে চাও। দেখ, যতই তোমরা বড়াই কর না কেন, আমি বলছি এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাদের করতে হবে, তোমাদের এই সমাজকে করতে হবে। হাঁ, মানদা যদি অস-চ্চরিত্রা হত, তা হলে তাকে তোমরা দূর করে দিতে, কেউ একটা কথাও বলতে পারত না। কিন্তু এই ঘটনাটা ভেবে দেখ দেখি? আমি এই এখনই মানদার কাছ থেকে আসছি। তার এখন যে রকম ভাব, তাতে সে নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবে। তা ছাড়া তার আর কি পথ আছে? আর কি পথ তোমরা তাকে দেখিয়ে দিতে পার, বল না?"

রমাসুন্দরীর পুত্র সিদ্ধেশ্বর এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। তিনি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ; তিনি উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তি; বয়সও তাঁহার ছত্রিশ সাঁইত্রিশ হইয়াছে। ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃতে এত বড় পণ্ডিত হইয়াও তিনি অল্পভাষী; তাই এতক্ষণ যে বাদ্‌বিতণ্ডা হইতেছিল, তাহাতে তিনি কোন মতই প্রকাশ করেন নাই। বিশেষতঃ,

তাঁহার পূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী যখন কেনারাম ভট্টাচার্য্যের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি সে আলোচনার মধ্যে কথা বলা সঙ্গত মনে করিলেন না। কিন্তু, তাঁহার মাতা যখন বলিলেন "কি পথ তোমরা তাকে দেখিয়ে দিতে পার, বল না ?" তখন সিদ্ধেশ্বর অতি ধীর ভাবে বলিলেন "মা, তুমিই একটা পথ দেখিয়ে দেও না।"

রমাসুন্দরী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পুত্রের মুখে নিবদ্ধ করিলেন ; একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই কহিলেন "পথ দেখিয়ে দিতে পারি, কিন্তু সে পথে চল্‌তে পারবি সিধু !"

সিদ্ধেশ্বর দৃঢ় স্বরে বলিলেন "তুমি যদি আদেশ কর মা, তুমি যদি সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাক, তা হলে তোমার এই অযোগ্য সন্তান সব করতে পারে।"

"তবে শোন্ সিধু, আমি যে এতক্ষণ কেনারামের সঙ্গে তর্ক করছিলাম, সে তোর মন বোঝবার জন্য ; সুবর্ণপুরের কালু মুখুয্যের জন্য আমার মাথাব্যথা পড়ে নাই। আমি ভাবছিলাম মানদার কথা—আমি ভাবছিলাম তোর কথা সিধু! আমার সে বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তুই আমাকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করবি, তারই জন্য এতক্ষণ এত কথা-বল্‌ছিলাম। শোন্ তবে আমার পথের কথা। আমি মানদাকে ঘরে নিয়ে যাব—দেবীপুরে নিয়ে যাব। এতদিনে দেবীপুরের নাম সার্থক করব। কেমন, পারবি এ ভার নিতে ?"

"বলেছি ত মা, তোমার আদেশ প্রতিপালনের জন্য সব করতে পারব।"

চণ্ডী বাবু এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই; এখন দেখিলেন ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না; বলিলেন "দিদি, সকল দিক ভেবে দেখেছ কি? ও-বাড়ীর বড়-বৌয়ের অবস্থার কথাই এখন তোমার মন অধিকার করে বসেছে; তাই তুমি আর কিছুই ভাবতে পারছ না। একটু স্থির ভাবে চিন্তা করে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে, কি কাজ তুমি করতে যাচ্চ। এই প্রথমেই ত দেখ, মুখুয্যে বংশের কি কলঙ্ক হবে? এর পর কি আর কোন ভদ্র ব্রাহ্মণ ওদের সঙ্গে আদান-প্রদান করবে? ওদের যে একঘরে হয়ে থাক্‌তে হবে, সে কথাটা ভেবেছ কি?"

"হাঁ ভাই চণ্ডি, সে কথা ভেবেছি। কালাচাঁদ মুখুয্যে যে পাপ করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না? তার বংশের কলঙ্ক ত দেশময় ছড়িয়ে পড়াই চাই! তাকে সকলে ঘৃণা করবে, তাই ত চাই। আর তোমরা যদি এমন নরপিশাচের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখ, তা হলে তোমাদেরও ত প্রায়শ্চিত্তের দরকার, তোমাদেরও শাস্তি হওয়া চাই!"

চণ্ডী বাবু বলিলেন "আমাদের কথা না হয় নাই ভাবলে। আমাদের ভাবনা আমরাই ভাবব; কিন্তু তোমাদের কথাটাও ত একবার ভেবে দেখতে হয়। তোমরা দেবীপুরের জমিদার, তা সকলেই জানে। তোমাদের যে সে অঞ্চলে অসীম ক্ষমতা, তাও আমার জান্‌তে বাকী নেই। তোমরা ইচ্ছা করলে অনেক অসাধ্য-সাধনও করতে পার, এ কথাও স্বীকার করি। কিন্তু,

তোমরা কি তোমাদের অঞ্চলের সমাজে যা ইচ্ছা তাই চালাতে পার? এমন ক্ষমতা কি তোমাদের আছে? তারপর ভেবে দেখ, দেবীপুরের তোমরা নয়-আনির জমিদার। সাত-আনির জমিদার মনোহর চাটুর্য্যের সঙ্গে তোমাদের যে রকম মনের মিল, তা আমি বেশ জানি। কেউ কারও ত্রুটী দেখ্‌লে ছেড়ে কথা বলে না। এ অবস্থায় তোমরা যে কাজ করতে যাচ্ছ, তাতে মনোহর বাবু যে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, এ ত আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তার ফল যে কি হবে, তা আর তোমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে না। ঘোর একটা দলাদলির সৃষ্টি হবে; তার পর, তার থেকে মনান্তর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা—কত কি যে হবে, তা বলা যায় না। কেমন দিদি, কেমন বাবা সিধু, আমার এ কথাগুলো সত্যি কি না, বল দেখি? আমাদের গাঁয়ের এই কেলেঙ্কারী মাথায় করে নিয়ে দেশে গিয়ে একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে, কি পৌরুষ বাড়বে, সেই কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? আজ যে অত্যাচার তোমরা স্বচক্ষে দেখ্‌লে, তাতে তোমাদের কেন, মানুষমাত্রেরই মন বিচলিত হ'তে পারে; কিন্তু, তার প্রতিবিধানের জন্য তোমাদের এত মাথাব্যথা কেন? তার জন্য এমন বিপদ ডেকে আনা কেন?"

রমাসুন্দরী বলিলেন "চণ্ডি, তুমি যে সব কথা বল্‌লে, আমি কি তা ভাবিনি, তুমি মনে করছ। আমি সব ভেবেছি। মানদার অবস্থা দেখে যে আমি বিচলিত হয়েছি, তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। কিন্তু, আমি যখন তোমাদের সঙ্গে এই সকল কথার আলোচনা

করছিলাম, তখন আমি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার ভবিষ্যৎ ফলের কথাও ভাবছিলাম, আর আমার ছেলে সিধুর মুখের দিকে চাচ্ছিলাম। সে মুখে আমি যে দীপ্তি, যে ভাব দেখ্‌তে পেয়েছি, তাতেই আমি সাহস করে এই ভার নিতে চাচ্ছি। কেমন সিধু?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "মামা, মায়ের আদেশ আমি মাথায় করে নিয়েছি। আজ আমি যে দৃশ্য দেখলাম, এতে আমার প্রাণে যে ভাবের উদয় হয়েছে, তা মামা, তুমি বুঝতে পারবে না। মায়ের আদেশ পেয়েছি। আমি বল্‌ছি, ও-বাড়ীর বড়-বৌকে আশ্রয় দেবার জন্য মনোহর কাকার সঙ্গে যদি বিবাদ করতে হয়, দেশের সকলের সঙ্গে যদি মনান্তর হয়, দেবীপুরের নয়-আনির বাড়ীকে যদি একঘরে হয়ে থাকৃতে হয়, তাতেও কুণ্ঠিত হব না। দেবীপুরের জমিদারী যদি বিকিয়ে যায়, তাতেও আমার অণুমাত্র দুঃখ হবে না। একটী অসহায়া, নিরপরাধা বিধবাকে সামাজিক নির্য্যাতন থেকে রক্ষা করবার জন্য আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে আমি পথের ভিখারী হয়েছি, এর চাইতে অধিক গর্ব্বের কথা আমি ভেবেই পাচ্ছি না। মা ঠিক কথা বলেছেন, যে সমাজ নিরপরাধা বিধবাকে এমন করে ত্যাগ করতে পারে, সে সমাজ হিন্দুসমাজ নয়। আমি সে হিন্দুয়ানীর বড়াই করতে চাইনে। না মা, তুমি ভেবো না। তোমার আদেশ পালন করবার জন্য আমি সমস্ত বিপদ মাথায় করে নিতে প্রস্তুত হয়েছি।"

হরিশ গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, "তোমরা যে যা বল্‌লে, সবই ত

শোনা গেল। কিন্তু আমি একটা কথা বলি, তাই কেন কর না। ও-বাড়ীর বড়-বৌয়ের জন্য তোমাদের প্রাণে ব্যথা লেগেছে, সে বেশ কথা ; কিন্তু, তাকে ঘরে নিতে চাও কোন্ বিবেচনায়? আমরা অবশ্য তাকে আমাদের সমাজে স্থান দিতে পারব না ; তোমরাও দেখে নিও, দেবীপুর সমাজেও তার স্থান হবে না ; মাঝের থেকে তোমরা অনেক বিপদ, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করবে। সকল দিক যাতে রক্ষা হয়, আমি সেই পরামর্শ দিচ্ছি। তোমাদের অর্থ আছে, তোমরা তা অনায়াসে করতে পার। বেশ ত, তোমাদের দয়া হয়েছে, তোমরা গোরাচাঁদের স্ত্রীকে কাশীতে পাঠিয়ে দেও ; সেখানে তার ভরণ-পোষণের জন্য যা ব্যয় হবে, তা তোমরা দিও। তবে তার মেয়েটীর কথা ভাববার বিষয় বটে! তারই বা কি। কাশী হোলো গে একটা সৃষ্টিছাড়া যায়গা। পয়সা খরচ করলে সেখানে বেশ্যার মেয়েও কুলীন বামুনের মেয়ে বলে পার হয়ে যায় ; এ ত সামান্য কথা। এই বুড়ো বামুনের কথাটা ভেবে দেখ, সব দিক্ যাতে রক্ষা হয়, আমি সেই সুপরামর্শই দিলাম।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন, "সে বিবেচনা পরে করা যাবে। আপাততঃ ওঁকে ত দেবীপুরে নিয়ে যাই। তারপর যা হয়, দেখব, কি বল মা?"

রমাসুন্দরী বলিলেন "সেই কথাই ভাল। সকালেই আমাদের যাওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলো সিধু! ঘাটে ত নৌকা বাঁধাই আছে ; কালই রওনা হতে হবে। আমি এখন ও-বাড়ী যাই ; মানদাকে আজ রাত্রিতে চোখের আড়াল করা হবে না।" এই বলিয়া তিনি কালাচাঁদদিগের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

[৫]

"কি হবে গিন্নি ?"

"কিসের কি হবে বড়-বৌ ?"

"বড় বৌ ! ও নাম ধরে আর আপনি আমাকে ডাকবেন না। বড়-বৌ ! সে ত নেই। সে নেই গো ! সে আর নেই ! আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্তও আমি এক গৃহস্থের বড়-বৌ ছিলাম গিন্নি ! এখন আর তা নেই ! সে সব আমার ঘুচে গেছে—চিরদিনের মত গেছে। কাল সকালে আর তার চিহ্নও থাকবে না। সে কথা বল্‌ছিনে গিন্নি, মেয়েটার কি হবে ? আমি চলে গেলে, কে তাকে দেখ্‌বে ? সে কার কাছে দাঁড়াবে ? তার যে আর কেউ নেই।" মানদা আর কথা বলিতে পারিলেন না ; তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন।

রমাসুন্দরীর কাছেই সুহার দাঁড়াইয়া ছিল ; তিনি তাহাকে মানদার কোলের কাছে বসাইয়া দিতে গেলেন। মানদা চীৎকার করিয়া সরিয়া বসিলেন ; বলিলেন "না, না, ওরে সুহার, তুই আমাকে স্পর্শ করিস্ না, আমার কাছে আসিস্ না। সরে যা মা আমার, সরে যা। তোর মা নেই ! তোর মা যে সন্ধ্যার পরে মরে গিয়েছে রে !"

সুহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া মায়ের গলা

জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মা, ও মা, তুমি অমন করছ কেন? ওগো, তোমরা দেখ, মা যে কেমন করছে।" সুহার কাঁদিয়া উঠিল।

রমাসুন্দরী মানদাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বসিলেন; কিন্তু, কি যে বলিবেন. তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। এ দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে দুইচারি জন স্ত্রীলোক সেখানে ছিলেন, তাঁহারা বলিলেন "ও বড়বৌ, অমন করছিস্ কেন? দেখ্ ত, সুহার কাঁদছে। ওকে কোলে কর; ওর মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে যা।"

মানদা বলিলেন "সব ভুলে যাব—সব আমি ভুলে যাব। আর একটু অপেক্ষা করুন আপনারা, আমি সব ভুলে যাব। ওগো, তোমরা কেউ আমার এই অভাগী মেয়েটাকে কোলে তুলে নেও; তোমরা কেউ বল যে, ওর মুখের দিকে চাইবে। তা হলেই আমি যাই। গিন্নি, আপনিই একবার বলুন! আপনার পায়ে ধরে বলছি, এই আমার শেষ প্রার্থনা—আপনি এই বাপ-মা-হারা মেয়েটাকে নিন্—আমি চলে যাই। আর যে আমি দেরী করতে পারছি নে। আর যে আমার সহ্য হচ্চে না। দেখ্‌বে তোমরা—এই দেখ না আমার বুকের মধ্যে কি আগুন জ্বলছে—আমার মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। আর যে আমি থাক্‌তে পারছি নে। আয় সুহার, তুইও আমার সঙ্গেই আয়! এ দেশে তোরও থেকে কাজ নেঃ। না, না, তোকে রেখে যাব না—তোকেও সঙ্গে করেই নিয়ে যাই। চল্ মা, চল্ অভাগীর মেয়ে, আমার সঙ্গে চল। ঐ নদীতে ডুবে সব জ্বালার

হাত থেকে নিস্তার—পাই গে! চল্ মা, চল্; এখানে তোর কেউ নেই। চল্।" এই বলিয়া পাগলিনীর মত সুহারের হাত ধরিয়া মানদা দণ্ডায়মান হইতে গেলেন।

রমাসুন্দরী তাহাকে জোরে কোলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "ও বড়বৌ, তুই পাগল হলি না কি? ও-সব কি বক্‌চিস্। কি, তোর হয়েছে কি?"

মানদা বলিলেন "কৈ, কি হবে? না, না, কিছুই হয় নাই। হবে আবার কি? তোমরা সবাই সরে যাও, আমাকে ছেড়ে দেও, আমি মেয়ে নিয়ে চলে যাই। এখানে যে আমি থাক্‌তে পারছি নে, এ ঘরের দিকে যে আমি চাইতে পারছি নে। ওরে, এ যে আমার দেবতার ঘর ছিল রে! তোমরা কেউ এই ঘরে আগুন ধরিয়ে দিতে পার? আমি তা হলে এই ঘরের মেজেয়—ঐ ঐখানে বসে সেই আগুনে পুড়ে মরি।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "ও সব কি কথা বল্‌ছিস মানদা? তুই চুপ কর্। তোর ভয় কি? আমি আছি। তোর মেয়ে সুহারের জন্য তোর ভাবনা হয়েছে? আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল্‌ছি, তোর মেয়েকে আমি নিলাম; তার সম্পূর্ণ ভার আমার উপর রইল। তুই এখন একটু স্থির হয়ে আমার কথা শোন্। আমি এ কথা মানি যে, নরাধমের স্পর্শে তোর দেহ কলুষিত হয়েছে। পশুটা যখন পাপ মনে তোর গায়ে হাত দিয়েছে, তখনই তোর শরীর অপবিত্র হয়েছে। কিন্তু তোর মন ত অপবিত্র হয় নাই; এ কথা ত তুই বেশ বুঝিস্। তোর

মনে ত কোন পাপ স্পর্শ করে নাই, তা ত তুই জানিস্, তবে এত কাতর হচ্চিস্ কেন? লোকে কত কথা বল্‌বে, কেমন? আমি তার ব্যবস্থা করেছি। আমি তোকে আর তোর মেয়েকে দেবীপুরে নিয়ে যাব। তুই সেখানে আমার মেয়ের মত থাক্‌বি; আমি তোকে কোলে করে রাখব; তোকে আমার সংসারের কর্ত্রী করে রাখব। কেউ তোকে ঘৃণা করতে পারবে না। তোর মেয়ের বিয়ে যাতে সুপাত্রের সঙ্গে হয়, আমি তা করব। তোকে এ দেশে থাক্‌তে হবে না;—এ মুখুয্যে-বাড়ী আর তোকে আস্‌তে হবে না,—এদের মুখ তোকে দেখ্‌তে হবে না। এর জন্য যত কিছু সহ্য করতে হয়, আমি করব। কা'ল সকালেই তোদের নিয়ে আমি দেবীপুরে চলে যাব।"

মানদা অবাক্ হইয়া রমাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; পাগলিনীর মত তাঁহার শূন্যদৃষ্টি!

রমাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন, মানদা তাঁহার কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার বুদ্ধি এখন প্রকৃতিস্থা নহে। তিনি বলিলেন "মানদা, আমি যা বল্‌লাম, শুন্‌তে পেয়েছিস্?"

মানদা অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন "হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ। কি বলছ?"

রমাসুন্দরী বলিলেন "কা'ল সকালে আমি তোদের দেবীপুরে নিয়ে যাব, বুঝলি?"

মানদা তেমনই ভাবে বলিলেন "আমাদের—দেবীপুরে! কেন? সে কোথায়? দেবীপুরে? কেন? এ যে আমার সুবর্ণপুর।

না, না, ওগো, আমি কোথাও যেতে পারব না—যাব না গো! আমি এই সুবর্ণপুরেই মরব। তোমরা জান না, আমি নয় বছর বয়সের সময় এই সুবর্ণপুরে এসেছি, আর এতকাল এখানেই আছি, —কোন খানেই ত যাই নাই। এখানেই আজ আমার শেষ হবে। তিনি যে আমাকে এই ঘরে এনে তুলেছিলেন! আমি কি এ ঘর ছেড়ে যেতে পারি। না, না—আমি কোথাও যাব না; আমি আজ এই ঘরে—ঐ যে তিনি এসেছেন—ঐ যে তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আমি এই ঘরের মধ্যেই মরব। আজই আমার যাবার দিন! তোমরা কেউ আমাকে বাধা দিও না—দিও না। কি বল্‌ছ—সুহার! হ্যাঁ, সুহার! তা—আমি ওকেও নিয়ে যাব। ওর গলা-টিপে মেরে ফেলে তার পর আমিও মরব। ঐ শোন না তোমরা, তিনি যে সেই কথাই বল্‌ছেন। আমি কোন দিন তাঁর কোন কথা অমান্য করি নি; আজও তাঁর কথা-মতই কাজ করব। তোমার পায়ে পড়ি গিন্নি! আমাদের নিয়ে যেও না। তোমরা সরে যাও—তোমরা আমাদের ছেড়ে দেও; আমরা মায়ে-ঝিয়ে তাঁর কাছে চলে যাই। তিনি ত ঘৃণা করছেন না—তিনি যে কোলে তুলে নিতে ডাক্‌ছেন। যাই গো—যাই—আর কি দেরী করা যায়—তিনি যে ডাক্‌ছেন—ঐ শোন।" বলিয়াই মানদা অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া সুহার কাঁদিয়া উঠিল "মা, ও মা! মা যে কথা বলে না!"

রমাসুন্দরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহির হইতে জল আনিয়া মানদার মুখে-চোখে মাথায় ছিটাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার

নাড়ীজ্ঞান ছিল; মানদার হাত দেখিয়া বলিলেন "ভয় নাই, মূর্চ্ছা গিয়েছে; এখনই জ্ঞান হবে। তোমরা ভাল করে বাতাস কর।"

ধীরে ধীরে বাতাস করিতে করিতে মানদার জ্ঞান-সঞ্চার হইল; তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতি কাতর স্বরে বলিল "মাগো, আর যে সয় না।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "মানদা, সবই সইতে হবে। সুহারের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ্; মেয়ে যে কেমন হয়ে গিয়েছে।"

"সুহার! আমি তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তাই ত, সুহারকে ফেলে কোথায় যাব। আয় মা, আয় আমার কোলে আয়। তোকে বুকে করে দেখি আগুন নেবে কি না।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "মানদা, অত কাতর হলে চল্‌বে না। তুই মরবি কেন? তোর কি হয়েছে। আমার কথা বেশ করে বুঝে দেখ, তোর কিছুই হয় নাই। তুই যে ভগবানের কাছে খাঁটি আছিস্। বল্ দেখি, আমার কথা ঠিক কি না?"

মানদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। কেহই কোন কথা বলিয়া তাঁহার এই ভাবনায় বাধা দিলেন না। অবশেষে মানদা অতি ধীর ভাবে বলিলেন "গিন্নি, তোমার কথা আমার মনে লেগেছে। তুমি ঠিক কথা বলেছ। তাই ত! আমি যদি মনে প্রাণে ঠিক থাকি, তা হলে আর চাই কি। আমি বল্‌ছি তোমাকে গিন্নি! আমি কোন পাপই করি নাই—আমার মন ঠিকই আছে। আমি তাঁরই স্ত্রী আছি! আমি কোন

অন্যায় কাজ করি নাই। যে যা বলে বলুক, না, কি বল গিন্নি, আমি খাঁটি আছি।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "আমার কথা তা হলে বুঝেছিস্ ত! তবে আর অমন করছিস্ কেন?"

মানদা তেমনই ধীর ভাবে বলিলেন "তা ত বুঝেছি গিন্নি, কিন্তু লোকে কি বল্‌বে! সকলে যে আমাকে কত কি বল্‌বে—আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে না। তা হলে আমি কেমন করে বাঁচব? তা হলে আমার সুহারের কি গতি হবে? তার যে বার বছর বয়স হোলো। তাকে কে নেবে গিন্নি! আমার সুহার!"

রমাসুন্দরী বলিলেন "সে কথা যে তোকে একটু আগেই আমি বল্‌লাম, তা বুঝি শুন্‌তে পাস্‌নি; তুই স্থির হয়ে শোন্। আমি তোদের দেবীপুরে নিয়ে যাব। সেখানে কেউ তোকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। আর যেমন করে হোক, তোর সুহারকে আমি ভাল ঘর বর দেখে বিয়ে দিয়ে দেব।"

মানদা বলিলেন "তা আর হয় না গিন্নি! আর হয় না। মনে ত বল বেঁধেছিলাম; কিন্তু সব যে ভেঙ্গে পড়ে। তা আর হবে না।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "হয় কি না হয়, সে আমি দেখে নেব। তুই এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর্ দেখি!"

মানদা বলিলেন "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা বলেছ! আহা, ঘুমাতে হবে বই কি! ঘুমই যে এখন আমার একমাত্র পথ। মা দুর্গা, আমার চোখে একবার ঘুম এনে দাও মা! সে ঘুম যেন আর না

ভাঙ্গে! ওগো, দয়াময়ী, আর তোমার কাছে কিছু চাইনে, আমার চোখে ঘুম এনে দাও—আমি সব ভুলে যাই—সব ভুলে যাই।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "আবার ও কি কথা! তুই একটু স্থির হ, মানদা! রাত যে অনেক হয়ে গেল!"

মানদা চারিদিকে একবার চাহিয়া বলিলেন "তাই ত, রাত যে অনেক হোয়েছে! ও সুহার! তুই একটু ঘুমিয়ে নে মা! অসুখ করবে যে। আয়, আমার কোলের কাছে আয়!" এই বলিয়া সুহারকে কোলের মধ্যে তুলিয়া লইয়া মানদা নীরব হইলেন।

রমাসুন্দরী এবং আরও দুই তিনটি স্ত্রীলোক সারা রাত্রি সেই স্থানেই বসিয়া কাটাইলেন। মানদা কখন চুপ করিয়া থাকেন, কখন আপন মনেই কত কথা বলেন; কেহই কিন্তু সে সকল কথার উত্তর দিলেন না।

এমনই করিয়া সেই কালরাত্রির অবসান হইল। প্রাতঃকালে রমাসুন্দরী জোর করিয়া মানদা ও সুহারকে নৌকায় লইয়া গেলেন। একটু পরেই তাঁহাদের নৌকা সুবর্ণপুর ত্যাগ করিল।

[৬]

পূর্ব্ব রাত্রিতে চণ্ডী বাবুর বাড়ীতে যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে কথাবার্ত্তা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। রমা-সুন্দরীর তেজে সকলেই যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত আরও একটী কারণ ছিল। সুবর্ণপুর গ্রামের সমস্ত সামাজিক ব্যাপারের যিনি অধিনায়ক বা অধিনায়িকা, তিনি সে বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি আর কেহই নহেন—গ্রামের পরমপূজনীয়া শ্রীযুক্তা শ্যামা ঠাকুরাণী। মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরাই বলুন, গাঙ্গুলী মহাশয়ই বলুন, আর মহাপণ্ডিত পুরোহিত ঠাকুরই বলুন, শ্যামা ঠাকুরাণীর কাছে কেহই মনুষ্য-পদ-বাচ্য নহেন। শ্যামা ঠাকুরাণীই এ গ্রামের সমাজকে শাসনে রাখিয়া থাকেন। পূর্ব্ব রাত্রিতে যখন গোলমাল উপস্থিত হয়, যখন চণ্ডী বাবুর বাড়ীতে পাড়ার সকলে সমবেত হন, তখন শ্যামা ঠাকুরাণীকে সংবাদ দেওয়ার কথা যে না উঠিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু তিনি এই সমস্ত দিন চণ্ডী বাবুর বাড়ীর এত বড় ব্যাপারের কার্য্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে গিয়াছেন এবং তাঁহার গৃহও গ্রামের অপর প্রান্তে, সেই জন্য এত রাত্রিতে তাঁহাকে বিরক্ত করা কেহই কর্ত্তব্য মনে করেন নাই; সেই জন্যই তাঁহাকে রাত্রিতে সংবাদ দেওয়া হয় নাই; সুতরাং কর্ত্তব্যও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

প্রাতঃকালে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইবে স্থির হইয়া সে রাত্রির মত সভা ভঙ্গ হয়।

এই স্থানে শ্রীযুক্তা শ্যামা ঠাকুরাণীর একটু পরিচয় দিতে হইতেছে। তিনি এই গ্রামেরই কিশোরী ঘোষাল মহাশয়ের কন্যা। ঘোষাল মহাশয়ের যখন স্ত্রী-বিয়োগ হয়, তখন শ্যামা ঠাকুরাণীর বয়স আট বৎসর। ঘোষাল মহাশয় আর দারপরিগ্রহ না করিয়া মেয়েটীকেই প্রতিপালন করিতে থাকেন। দশম বৎসর বয়সে, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহারও অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শ্যামার বিবাহ দেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছয়মাস যাইতে না যাইতেই শ্যামা বিধবা হন; তাঁহাকে আর স্বামীর ঘর করিতে হইল না। সেই হইতে শ্যামা ঠাকুরাণী পিত্রালয়েই বাস করিতেছেন। বছর আট পরে যখন কিশোরী ঘোষাল মারা যান, তখন তিনি তাঁহার যে সামান্য জোত-জমা ছিল, তাহা বিধবা কন্যা শ্যামার ভরণ পোষণের জন্য লেখা পড়া করিয়া দিয়া যান। শ্যামার অবর্ত্তমানে ঘোষাল মহাশয়ের জ্ঞাতিদের মধ্যে যাহার আইন অনুসারে প্রাপ্য হইবে, তিনিই বিষয় পাইবেন।

সেই হইতে শ্যামা ঠাকুরাণী এই গ্রামেই বাস করিতেছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন শ্যামা ঠাকুরাণীর বয়স প্রায় ৬০ বৎসর; কিন্তু তাঁহাকে দেখিলে কেহ চল্লিশের উপর বলিয়া কিছুতেই মনে করিতে পারেন না। দশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া এই পঞ্চাশ বৎসর কাল শ্যামা ঠাকুরাণী নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন; সুবর্ণপুরের কেহ কোন দিন

তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারে নাই। এই চরিত্র-বলেই শ্যামা ঠাকুরাণী গ্রামে একাধিপত্য করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার যে জমাজমি আছে, তাহার আয় হইতে তাঁহার বেশ চলিয়া যায়; গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কাহারও মুখের দিকে চাহিতে হয় না; জমাজমির ব্যবস্থার জন্যও শ্যামা ঠাকুরাণী কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না; নিজেই সমস্ত করেন। দুদশ টাকা সুদেও তিনি লাগাইয়া থাকেন; সকলে বলে তাঁহার হাতেও কিছু আছে।

তাহার পর শ্যামা ঠাকুরাণী পরোপকারে কখনও পরাঙ্মুখ নহেন; গ্রামের সকলেরই বিপদ-আপদে তিনি বুক দিয়া পড়িয়া থাকেন। এই সকল গুণের জন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে। আবার সকলে তাঁহাকে বিশেষ ভয়ও করে, কারণ শ্যামাঠাকুরাণীর মুখের সম্মুখে কাহারও দাঁড়াইবার যো নাই; রাগ ও অভিমান তাঁহার অত্যন্ত বেশী; তাঁহার মতের প্রতিবাদ করিলে আর রক্ষা নাই; তিনি তখন একেবারে উগ্রচণ্ডা হইয়া উঠেন। তাঁহার অভিমানে আঘাত করিতে কেহই সাহস করে না। সকলেই তাঁহার পরামর্শমত কাজ করিয়া থাকে।

রমাসুন্দরী যে অতি প্রত্যূষেই মানদা ও তাহার মেয়েকে লইয়া চলিয়া যাইবেন, একথা রাত্রিতে কেহই ভাবেন নাই; তিনি যদিও সে কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাতঃকালে শ্যামা ঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিয়াই রমাসুন্দরী কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। রাত্রিতে যাহাই বলুন, শ্যামা ঠাকুরাণীকে উপেক্ষা করিয়া রমাসুন্দরী কিছুই করিবেন না, এ কথা সকলেই

স্থির জানিতেন। শ্যামা ঠাকুরাণী যদি রমাসুন্দরীর প্রস্তাবে মত না দেন, তাহা হইলে মানদাকে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইবে, এই কথা ভাবিয়াই রমাসুন্দরী প্রাতঃকালেই যাত্রা করিয়াছিলেন ; পাড়ার কেহই সে কথা জানিতেও পারে নাই ; চণ্ডী বাবুও তাঁহার ভগিনীকে নিষেধ করিতে সাহসী হন নাই ; তাঁহার যাহা বক্তব্য, তাহা তিনি পূর্ব্ব রাত্রিতেই বলিয়াছিলেন। রমাসুন্দরীকে ত তিনি চটাইতে পারেন না, ভগিনীর সাহায্যেই তিনি এখন গ্রামের দশজনের একজন। এ অবস্থায় তিনি আর আপত্তি করিলেন না। রমাসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর কথাটা ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

শ্যামা ঠাকুরাণী এত বড় ব্যাপারের কিছুই রাত্রিতে জানিতে পারেন নাই। পূর্ব্বদিন চণ্ডী বাবুর বাড়ীতে অধিক পরিশ্রম হওয়ায় পরদিন শয্যা ত্যাগ করিতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইয়াছিল। তিনি যখন ঘরের বাহিরে আসিয়া প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মে হাত দিয়াছেন, এমন সময় প্রতিবেশিনী হরি সরকারের মা আসিয়া বলিল "ও দিদি! তুমি বুঝি এই উঠ্‌লে? রাতের খবর বুঝি কিছুই জান না?"

শ্যামা ঠাকুরাণী বলিলেন "হ্যাঁ ভাই, কাল বড় খাটুনী গিয়াছে। বুড়ো বয়স, এখন আর অত পরিশ্রম সহ্য হয় না, তাই আজ সকালে উঠ্‌তে একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। তা, কি বল্‌ছিলে, ঐ রাতের খবর! কৈ না, আমি ত কিছুই জানিনে।"

"সে কি কথা, এমন একটা ব্যাপার হয়ে গেল, আর তুমি জান না।"

শ্যামা ঠাকুরাণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন "না, আমি কোন খবরই পাই নি। কি, হয়েছে কি ?"

"হবে আর কি ? গাঁময় একেবারে ঢি ঢি পড়ে গেছে। ও-পাড়ার কালু মুখুয্যে না কি রাত্তিরে তার ভাই-বৌকে বেইজ্জত করেছে। তাই নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড! চণ্ডী মুখুয্যের বোন সুন্দরী ঠাকুরাণী ওদের ছেলের ভাতে এসেছিল কি না। সে না কি আজ সকালেই গোরা মুখুয্যের বৌ আর তার মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে।"

শ্যামা ঠাকুরাণী উগ্রভাবে বলিলেন "কি বলিস্, এত বড় কাণ্ড হয়ে গেল, আর আমি খবরটাও পেলুম না, আমাকে কেউ কথাটাও জিজ্ঞাসা করল না। না, তুই হয় ত শুন্‌তে ভুল করেছিস্। তাও কি কখন হয় ?"

"আমি কি আর না জেনে-শুনেই কথা বল্‌ছি। আমার ছেলে যে কাল রাত্রিতে মুখুয্যে-বাড়ীতেই ছিল। সে আর ঐ গোলমালে বাড়ী আস্‌তেই পারে নাই। এই সকাল বেলা এসে সব কথা বল্‌ল। তারা নৌকো ছেড়ে দিয়ে চলে গেলে তবে ত আমার ছেলে বাড়ী এসেছে।"

শ্যামা ঠাকুরাণী রাগে, অভিমানে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। কি, এত বড় কথা! এখনও তিনি মরেন নাই; ইহারই মধ্যে এমন অশ্রদ্ধা! তাঁহাকে না জানাইয়াই ও-পাড়ার লোকেরা এত বড় কাজটা করিয়া ফেলিল। তিনি তখন ক্রোধভরে বলিলেন "বেশ, যার যা ইচ্ছে, সে তাই করুক গে! শ্যামা বামণী এ গাঁয়ের আর

কাহার কোন কথার মধ্যে নেই। কি বেইমান গো, এই গাঁয়ের লোকগুলো! এই যে এতদিন দিন নেই, রাত নেই, যে যখন বিপদে পড়েছে, যার যখন দরকার পড়েছে, তখনই এই শ্যামা বামণী না খেয়ে না দেয়ে একেবারে বুক দিয়ে পড়েছে, এ বুঝি তারই ফল। যাক্ আমি আর কারো কিছুর মধ্যে নেই। কারও বাড়ীও যাব না, কারও কোন কথাতেও থাক্‌ব না। আমি কি কারও খাই না ধারি যে, যে ডাক্‌বে তার বাড়ী যাবো। আজ থেকে নাকে-কাণে খত দিচ্ছি হরির মা! আমার পায়ে এসে মাথা খুঁড়লেও কারও উপকার করছিনে। এত হেনেস্তা, এমন অপমান!" শ্যামা ঠাকুরাণী এই বলিয়াই ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন; হরি সরকারের মা প্রাঙ্গণে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপন কাজে চলিয়া গেল।

শ্যামা ঠাকুরাণীর রাগও হইল, অভিমানও হইল; কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপারে তাঁহাকে না ডাকিয়া, তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া যে গ্রামের সকলে একটা কাজ করিয়া বসিল, ইহাতে মুখে তিনি যতই উপেক্ষা প্রদর্শন করুন না কেন, তাঁহার মনে কিন্তু বড়ই বাজিল। গ্রামের মধ্যে তাঁহার যে একাধিপত্য ছিল, তাহা এক কথায় ছাড়িয়া দিতে ত তিনি পারেন না; তাহা হইলে যে তিনি একেবারে দশজনের একজন হইয়া পড়িবেন; ভবিষ্যতে যে কেহই তাঁহাকে মানিবে না। সুতরাং এমন করিয়া সমস্ত সম্পর্ক ছাড়িয়া দিয়া সুবর্ণপুরে বাস করা তাঁহার পক্ষে একেবারে যে অসম্ভব। গ্রামের দশজনের দশ কথা, দশ ব্যাপার লইয়াই যে তিনি জীবনের এই সুদীর্ঘকাল কাটাইয়াছেন। তাঁহার আর

গৃহকর্ম্ম এমন কি ? বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার এক বেলার দুটা হবিষ্যি, তার জন্য ত আর সারা দিন-রাত দরকার হয় না ; জোতজমা ও খাতক লইয়াই বা কতক্ষণ সময় কাটে ?

শ্যামা ঠাকুরাণী ঘরের মধ্যে যাইয়া এটা ওটা নাড়াচাড়া করেন, আর ঐ কথাই তাঁহার মনে হয়। তাই ত, এতদিন না ততদিন, গ্রামের লোক তাঁহাকে এতবড় কাণ্ড সম্বন্ধে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। একবার ভাবিলেন, কাজ নাই, চুপ করিয়াই থাকিবেন ; কিছুর মধ্যেই যাইবেন না ; কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, না, সে কিছুতেই হইতে পারে না। কথাটার বৃত্তান্ত তাঁহার জানিতেই হইতেছে। তখন আর তিনি ঘরে থাকিতে পারিলেন না ; কাজকর্ম্ম আর করা হইল না ; বাসি কাজ পড়িয়াই রহিল। তিনি ঘরে তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইলেন।

রাস্তা দিয়া যাইতে ও-বাড়ীর তারার পিসি তাহার উঠান হইতে বলিল "কি গো দিদি ঠাকরুণ, মুখুয্যে বাড়ী যাচ্ছ বুঝি। তা তুমি না গেলে চলবে কেন ? বাবা গো, এমন কথা ত কখন শুনিনি দিদি! তুমি গাঁয়ে আছ, কা'ল রাত্তিরেই মিটিয়ে দিতে পার নেই। আজ আবার শুনলাম, মাগীটা না কি গাঁ ছেড়ে গিয়েছে ? হ্যাঁ দিদি ঠাকরুণ, তুমি গাঁয়ে থাকতে এক গাঁয়ের কলঙ্ক আর এক গাঁয়ে যেতে দিলে। তা যাই বল না, এ কাজটা তোমার ভাল হয় নাই।"

শ্যামা ঠাকুরাণী আত্ম-প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বলিলেন "তা কি করি বল বোন! রমা আমার ত পর নয়। তার সঙ্গে আমার

যে ভাব, সে আমাকে যে রকম ভালবাসে, তাতে তার কথাও ফেলে দেওয়া যায় না। তাইতে বুঝলে বোন! ছেড়ে দিতে হোল। এখন যাই দেখি, সব মিটিয়ে দিয়ে আসি। এ গাঁয়ের কোন কাজেই ত এই শ্যামা বামণী না হলে চলে না।"

তারার পিসি বলিল "সে কি আর বল্‌তে দিদি ঠাকরুণ, তুমি আছ বলেই আমাদের এই গাঁটা ঠিক আছে, নইলে এতদিন কি কেউ গাঁয়ে বাস করতে পারত। তা হ্যাঁ দেখ, ও-বেলা তোমার ওখানে যাব মনে করেছিলাম। তা এখনই দেখা হয়ে গেল, এখনই কথাটা বলি। তারা বল্‌ছিল 'পিসিমা, হাতে ত টাকা নেই, জমিদারের খাজনা তিন টাকা দুই-এক দিনের মধ্যেই দিতে হবে। তুমি যদি বামুনঠাকরুণের কাছ থেকে ধার করে এনে দাও।' তাই তোমার কাছে যেতে চেয়েছিলাম। পথেই দেখা হোলো। ও-বেলা কখন যাব দিদিঠাকরুণ!"

শ্যামা ঠাকরুণ বলিলেন "এই যে তারা সে-দিন দশ টাকা নিয়ে গেছে; আবার আজ টাকা! দশ দশ টাকা; কি করে শোধ দেবে। তোমরা যে টাকা দিয়ে কি কর, তা বুঝতে পারি নে। আর আমারই কি ন-শ পঞ্চাশ আছে যে, যার যখন দরকার পড়বে, তখনই কুলোবো। এখন তাড়াতাড়ি, আর কথা বল্‌তে পারছিনে। তুমি আর যেও না, তারাকেই ও-বেলা পাঠিয়ে দিও। দেখ্‌ব, কি করতে পারি।"

তারার পিসি বলিল "আর করা-করি নয় দিদি ঠাকরুণ, এ দায়টা তোমার উদ্ধার করে দিতেই হবে। তুমি না হলে

আমাদের এ গরিবদের দুঃখু আর কে বোঝে বল। তা যাও, আর দেরী করো না। মুখুয্যেদের যে এমন ব্যাভার, তা ত এতদিন জানতাম না।"

শ্যামা ঠাকুরাণী এ কথার কোন উত্তর না দিয়াই অগ্রসর হইলেন। একটু যাইতেই রাস্তার বাম পার্শ্বে রামতারক ভট্টাচার্য্যের বাড়ী। শ্যামা ঠাকুরাণীর মনে পড়িল, তারকের ছেলেকে ত কাল দেখা হয় নাই। অমনি রাস্তা ছাড়িয়া তিনি ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর দিকে গেলেন। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াই বলিলেন "ওগো বৌমা, ছেলেটা কা'ল কেমন ছিল? কা'ল আর আস্‌তে পারি নি; সারাদিনটা মুখুয্যে বাড়ীর ব্যাপারে ছিলাম; ছেলেটার কথা আর মনে হয় নাই। নিয়ে এস ত দেখি? কা'ল ক'বার দাস্ত হয়েছিল?"

রামতারকের স্ত্রী তাড়াতাড়ি ছেলে কোলে লইয়া উঠানে আসিয়া বলিল "কা'ল একটু ভালই ছিল। পেটের বেদনাও একটু কম, দাস্তও এই পাঁচ ছয়বার হয়েছিল। তা মা, আসন এনে দিই, একটু বোসো।"

শ্যামা ঠাকুরাণী বলিলেন "না মা, আমার কি বস্‌বার সময় আছে। ভয় নেই, আমাশয় কি না, সারতে একটু সময় নেবে। ঐ যে শিকড় তোমাকে দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছি, আজও তারই রস একটু আদার রসের সঙ্গে খাইয়ে দিও। আর দুই-একদিন সাবধানে রেখো, ছেলে সেরে উঠ্‌বে। কোন অত্যাচার করো না বৌমা! কৈ, তারক কৈ? তাকে ত দেখ্‌ছিনে!"

তারকের স্ত্রী বলিল "সকালে উঠেই তিনি মুখুয্যে-বাড়ী গিয়েছেন। হ্যাঁ মা, মুখুয্যে-বাড়ী কি হয়েছে? ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে উনি বল্‌লেন, সে সব শুনে কাজ নেই। কোন খুন-খরাবৎ হয় নি ত!"

শ্যামা ঠাকুরাণী বলিলেন "বৌমা, সে সব কথা আর তোমার শুনে কাজ নেই। তোমরা বৌ-মানুষ, সে কথা শুন্‌লে লজ্জায় তোমাদের মাথা হেঁট হবে। আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক, পরের কথায় মধ্যে যেও না।"

তারকের স্ত্রী তখন নতজানু হইয়া শ্যামা ঠাকুরাণীর পদধূলি লইয়া প্রথমে ছেলের মাথায় দিল, তাহার পর নিজের মাথায় লইয়া বলিল "সেই আশীর্ব্বাদই কর মা! তাই যেন হয়। ফিরে যাবার সময় আর একবার খোকাকে দেখে যাবে ত। আমি এখনই ওষুধ এনে খাইয়ে দিচ্ছি।"

শ্যামা ঠাকুরাণী বলিলেন "আর ত ভয়ের কিছু নেই। দেখি, ফিরবার সময় যদি পারি ত একবার খোঁজ নিয়ে যাব। আমার কি মা, সোয়াস্তি আছে, না অবসর আছে। এই গাঁয়ের দশ তাল নিয়েই আমি আছি।"

তারকের স্ত্রী বলিল, "তাই থাক মা, তাই থাক। তুমি আছ, তাই বিপদ-আপদে ভয় হয় না; ডাক্‌লেই তুমি এসে উপস্থিত হও। কত যে বল ভরসা তোমার করি মা, তা এক মুখে বল্‌তে পারিনে।"

শ্যামা ঠাকুরাণী বলিলেন "আর দেরী করতে পারছিনে। দেরী

করে গেলে সবাই একেবারে হাঁ হাঁ করে উঠ্‌বে। তাই দেখ বাছা, তোরা আছিস্ গ্রামের পুরুষ-মানুষ; তোরা লেখাপড়া জানিস্; তোদেরও বুদ্ধি-বিবেচনা আছে; কিন্তু যে কাজটী পড়বে, অমনি ডাক্ এই শ্যামা বামনীকে। এক কাল ছিল, যখন এসব পেরে উঠতাম; এখন বয়সও হয়েছে, এখন কোথায় বসে ঠাকুর দেবতার নাম করব, না কে কোন্ মুখুয্যে তার ভাই বৌয়ের উপর অত্যাচার করল, এখন চল্‌লাম তার সালিস্ করতে।"

তারকের স্ত্রী বলিল "তা হলে কথাটা সত্যি না কি? ও মা, কি ঘেন্না, কি লজ্জা! আমি অমনি একটু আভাস পেয়েছিলাম। তা যাক্‌গে, তুমি ঠিক্ বলেছ, ও-সব লজ্জার কথা, কলঙ্কের কথা গেরস্তর বৌদের না শোনাই ভাল! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে মা, তাড়াতাড়ি যদি না থাকে ত আসন এনে দিই, একটু বোসো।"

"না, না, আর বস্‌বার সময় নেই" বলিয়া শ্যামা ঠাকুরাণী ভট্টাচার্য্য-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। সদর রাস্তায় উঠিবার সময়ই দেখিলেন, মুখুয্যেপাড়ার দিক হইতে হরিশ গাঙ্গুলীর ছেলে মহিম আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই শ্যামা ঠাকুরাণী রাস্তার পার্শ্বেই দাঁড়াইলেন। মহিম তাঁহাকে দূর হইতেই দেখিয়াই একটু দ্রুতগতিতে আসিয়া বলিল "পিসিমা, আমি যে তোমার বাড়ীতেই যাচ্ছিলাম।"

শ্যামা ঠাকুরাণী বলিলেন "আমার বাড়ীতে! কেন, তোর কিছু দরকার আছে না কি?" এই বলিয়াই তিনি নিজের বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইলেন, যেন বাড়ীর দিকেই যাইবেন।

মহিম বলিল "বাবা পাঠিয়ে দিলেন তোমাকে ডাক্‌তে। এখনই একবার চণ্ডী বাবুর বাড়ীতে যেতে হবে। পাড়ার সকলেই তোমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করছেন।"

শ্যামা ঠাকুরাণী একটু অভিমানের সুরে বলিলেন "আমার জন্য অপেক্ষা, কেন? আমি গরিব বামুণের বিধবা মানুষ; গাঁয়ের এক কোণে পড়ে আছি; আমার আর তত্বতলাসের দরকার কি? হাঁ, যদি রমার মত জমিদার হতাম, তা হোলে তোরাই দিনের মধ্যে পঁচিশ-বার খোজ নিতি। বল্‌গে যা, আমার এখন সময় নেই। আমার যাবারই বা দরকার কি? তারকের ছেলেটার অসুখ, তাই দেখ্‌তে এসেছিলাম। আমি যেতে পাচ্ছিনে। তোরাই আছিস্, তোরাই এখন গাঁয়ের প্রধান হয়েছিস্। তোরাই যা হয় কর গিয়ে, আমার খোজ কেন?" এই বলিয়া শ্যামা ঠাকুরাণী নিজ গৃহের দিকে দুই তিন পা বাড়াইলেন।

মহিম বলিল "ও কি কথা বল্‌ছ পিসিমা! তুমি না হ'লে কি আমাদের চলে। কা'ল রাত্রিতেই যখন পাড়ার সকলে একত্র হলেন, তখন আমিই বলেছিলাম, এখনই শ্যামা পিসিকে খবর দেওয়া হোক্। তাতে সকলেই বল্‌লেন যে, বুড়ো মানুষ, এই সারাদিন খেটেখুটে সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হয়ে বাড়ী গিয়েছেন, এখন আর তাঁকে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই। কা'ল সকালে তাঁকে ডেকে এনে একটা ব্যবস্থা করলেই হবে। তাইতেই ত তোমাকে তাঁরা ডাকৃতে পাঠিয়েছেন।"

"হ্যাঁরে, শুন্‌লাম না কি বৌটাকে আর তার মেয়েটাকে রমা নিয়ে গিয়েছে ?"

মহিম বলিল "হ্যাঁ, আজ ভোরে তাঁরা চলে গিয়েছেন।"

"চলে যদি গিয়ে থাকে, তোরা যদি যেতে দিয়ে থাকিস্, তা হ'লে এখন আবার তার ব্যবস্থা কি ?"

"আমরা কি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আজ ভোরেই তাঁরা যাবেন। কা'ল রাত্রিতে ঐ রকম একটা কথা উঠেছিল, এই মাত্র। তাই যে হবে, তা আমরা জান্‌তাম না, বুঝতেও পারি নাই।"

"তা হ'লে বল্, কাউকে জিজ্ঞাসা না করে চণ্ডী মুখুয্যে এই কাজ করেছে ? এর একটা ব্যবস্থা করা চাই। চণ্ডী মুখুয্যে কেমন ছেলে, তা দেখ্‌তে হবে। মনে করেছিলাম, এ সবের মধ্যে যাব না ; কিন্তু চণ্ডী মুখুয্যের এত বড় বাড় বাড়ন্ত কেমন করে হোলো, সেটা বুঝতে হবে। চল্, যাই দেখি।" এই বলিয়া শ্যামা ঠাকুরাণী বাড়ীর দিক হইতে ফিরিয়া মুখুয্যে-পাড়ার দিকে চলিলেন। মহিম আর বাক্যব্যয় না করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল।

[৭]

চণ্ডী বাবুর বাড়ীতে পৌছিয়াই শ্যামা ঠাকুরাণী দেখিলেন, পাড়ার অনেকেই সেখানে সমবেত হইয়াছেন। তিনি কোন প্রকার ভূমিকা না করিয়া একেবারে অতি কঠোর স্বরে চণ্ডী বাবুকে আক্রমণ করিলেন; বলিলেন "আচ্ছা বলি চণ্ডীচরণ, তুমি এমনই কি গাঁয়ের মাতব্বর হয়ে বসেছ, যে কাউকে কিছু না বলে এমন কাজটা করে বস্‌লে।"

চণ্ডী বাবু বলিলেন "কৈ, আমি ত কিছুই করি নাই।"

"কর নাই? তোমার বোন বড় জমিদার, তা জানি; কিন্তু তাই ব'লে সে যে আমাদের গাঁয়ের এই কলঙ্কটা দশ গাঁয়ে ছড়িয়ে দিতে গেল, আর তুমি তাতে কথাটাও বল্‌লে না. এ কি ভাল হোলো?"

চণ্ডী বাবু বলিলেন "আমি কেন তা করতে যাব? দিদি ওদের নিয়ে গেলেন, তাতে আমার হাত কি? আমি নিষেধ করবারই বা কে? তবুও এঁদের জিজ্ঞাসা কর, আমি আপত্তি করেছিলাম কি না।"

"তুমি আপত্তি কর্‌লে, আর তোমার বাড়ীর বৌকে মেয়েকে তারা জোর করে নিয়ে গেল! কাকে বোকা বোঝাও তুমি চণ্ডী-চরণ! আমার বয়স এই ষাট পার হয়ে গেল; তোমাদের হাটহদ্দ

সবই আমি জানি। তোমার দিদি বড়মানুষ আছেন, বেশ কথা। তিনি তাঁর নিজের দেশে, নিজের জমিদারীতে গিয়ে তাঁর ক্ষমতা দেখান। আমাদের গাঁয়ের বৌকে তিনি অমন করে নিয়ে যাবার কে? তাই বল ত শুনি? আর, তুমি এর ভিতর না থাকলে, সে যতবড় লোকই হোক না কেন, এমন কাজ করতে পারে?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন বেগতিক; তিনি বলিলেন "সে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে; এখন এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার কি হবে, তাই বল। আমরাই কি জানি যে, তারা আজ ভোরেই ওদের নিয়ে চলে যাবে। কা'ল রাত্রে ঐ রকম একটা কথা হয়েছিল বটে; কিন্তু তার ত কোন মীমাংসাই হয় নাই। চণ্ডীর এ কাজটা যে গর্হিত হয়েছে, এ কথা বলতেই হবে। তাদেরও বিবেচনা করা উচিত ছিল।"

শ্যামা ঠাকুরাণী বলিলেন "সে ত ঠিক্ কথা। আমাদের গাঁয়ের বৌ দোষ-ঘাট করে থাকে, আমরাই তার শাস্তি দেব, আমরাই তার ব্যবস্থা করব; তারা কোথাকার কে যে, গাঁয়ের বৌকে এমন করে নিয়ে যায়। এতে যে তোমাদের একেবারে মাথা কাটা গেল, তা বুঝতে পেরেছ।"

একটী যুবক সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার আর সহ্য হইল না; সে বলিল "কাজটা অন্যায়ই বা কি হয়েছে? তোমরা ব্যবস্থা করলে, সেই বৌটাকে তাড়িয়ে দেবার। তাঁরা দয়া করে তাকে আশ্রয় দিয়ে নিয়ে গেলেন। এতে তাঁদের অপরাধটা কি হোলো।"

শ্যামা ঠাকুরাণী বলিলেন "তাড়িয়ে দেবে না, কি মাথায় করে নাচ্‌বে। চুপ কর্‌, তোরা ছেলে-মানুষ, এ সব কথার তোরা কি বুঝবি। কত বড় অপমানটা হৌলো জানিস্‌।"

যুবকও ছাড়িল না; বলিল "আর সেই নিরপরাধা বৌটীকে বাজারে দাঁড় করিয়ে দিলে ভারি আমাদের মান বাড়ত। যে অপরাধ করল, তার কোন শাস্তির কথা নেই, কথা হোলো কি না, যারা শত বিপদ, শত লাঞ্ছনার ভয় না করে, সেই অনাথাকে আশ্রয় দিল, তাদিকে কেমন করে নির্য্যাতন করা যায়, তারই ব্যবস্থা।"

শ্যামা ঠাকুরাণী বলিলেন "জানিস্‌ নে, শুনিস্‌ নে; মাঝের থেকে মোড়োলী করতে আসিস্‌। এই যে শ্যামা বামনী দে"্‌ছিস, এর কাছে কিছুই ছাপা নেই। ও বৌটা ঐ রকমই বজ্জাত ছিল। আমি আর কি না জানি; তবে গাঁয়ের বৌ, তাই এতদিন চাপা দিয়ে রেখেছিলাম। হয় না হয়, ঐ ত কালাচাঁদ বসে আছে, ওকে জিজ্ঞাসা কর্‌। আসল কথা ত জানিস্‌নে। এতকাল গেল, কাঁলাচাদ কিছু করল না; আর কা'ল রাত্তিরে, পাশের বাড়ীতে দশ গাঁয়ের লোক জমা, সেই সময় বৌকে আক্রমণ করতে গেল; এও কি বিশ্বাসের কথা।"

আর একটী যুবক বলিল "সে কি কথা পিসিঠাকরুণ, আমরা যে সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমরা যে স্বচক্ষে দেখেছি।"

"ছাই দেখেছিস্‌। আসল কথা ত তোরা বুঝলিনে। আমি

শোনা মাত্র ও-সব বুঝে নিয়েছি; আর আমি সবই জানি কি না। হয় না হয় জিজ্ঞাসা কর ঐ কালাচাঁদকে।"

যুবক বলিল "ওঁকে আবার কি জিজ্ঞাসা করব। তোমরা বিচার না কর, সে ভার আমরাই নেব।"

শ্যামা ঠাকরুণ বলিলেন "তোর যে ভারি আস্পর্দ্ধা দেখেছি রে রেমো! তুই পাতা ইংরেজী পড়ে দেখ্‌ছি বাপ-দাদাকেও মানিস্ নে। এই বুঝি তোদের লেখা-পড়া শেখা। আমরা দশজন বুড়ো-বুড়ি কথা বল্‌ছি, তার মধ্যে তোরা কথা বল্‌তে আসিস্ কেন?"

রাম বলিল "অন্যায় দেখ্‌লেই কথা বল্‌তে হয়। গোরাচাঁদ দাদার স্ত্রীকে এ গাঁয়ের কে না জানে। তাঁর মত সতী লক্ষ্মী গাঁয়ে কয়জন আছে? আর তোমরা কি না তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক দিতে যাচ্ছ। আর যে এমন পাপের কাজটা করল, তাকে কিছু বল্‌ছ না। এ আমরা সইব না, তাতে যিনি যা বলুন।"

শ্যামা ঠাকরুণ দেখিলেন যে, এই যুবকদের সঙ্গে তিনি পারিয়া উঠিবেন না; তখন একটু ধীর ভাবে বলিলেন "আচ্ছা, তোরা যে এত গোল করছিস্, কিন্তু ব্যাপারটা কি, তা একবার ঐ কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসা করেছিলি।"

"ওঁকে আবার কি জিজ্ঞাসা করব। আমরা যে তখন বাড়ীর উপর ছিলাম, আমরা যে সব দেখেছি।"

"দেখ্‌লেই ত হয় না, শুন্‌তেও হয়। আমি ত ছিলাম না তখন; কিন্তু কি হয়েছিল, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। ঐ গোরার বৌটার স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না; তা তোমরা না

জান্‌তে পার, আমি জানি। কালাচাঁদ তাই জানতে পেরে কা'ল তাকে শাসন করতে গিয়েছিল। এই হোলো ব্যাপার। বৌটা তাই এই সোর-গোল করে নিজের সাফাই দেখাল। নইলে কালাচাঁদ কি এমন কাজ করতে পারে? তার স্বভাব ভাল না, তা সকলেই জানে; কিন্তু এই যে এতকাল গেল, এর মধ্যে তোমরা কেউ বল্‌তে পার যে, ও কোন দিন কোন গেরস্তর বৌ-ঝির দিকে কু-নজরে চেয়েছে। এ সব খেলা বুঝতে তোমাদের অনেকদিন লাগ্‌বে। তা, সে কথা যাক্, তোমরা ত অনেক প্রবীণ লোকই এখানে রয়েছ, তোমরা যে কোন কথাই বল্‌ছ না? এখন কি ছেলেদের হাতে সব বিচার-আচার ফেলে দেবে? তাই যদি তোমাদের অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে আর আমাকে ডাকা কেন?"

এইবার একটী যুবক খুব জোরের সঙ্গে বল্‌ল, "দেখ শ্যামা পিসি, তুমি কিছু মনে কোরো না, কিন্তু তুমি যা বল্‌লে, তার একটা কথাও সত্য নয়, এ আমি খুব বল্‌তে পারি। ও-বাড়ীর বড় বৌয়ের স্বভাব মন্দ ছিল, এমন কথা গাঁয়ের কেউ কখন বল্‌তে পারবে না। আজই তোমার মুখে শুনলাম। এ কথা আমরা বিশ্বাস করিনে। কর্ত্তাদের যা ইচ্ছা হয়, তাঁরা করতে পারেন; আমরা কিন্তু বল্‌ছি, আমরা কালাচাঁদ মুখুয্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না; আর পারি ত, তাকে এই গাঁ-ছাড়া করব। এমন একটা ভয়ানক পাপের কাজ যে করল, তোমরা তাকে নির্দ্দোষী বলতে চাও; আর যার কোন দোষ নেই, যে সতী-সাধ্বী, তার নামে তোমরা মিথ্যা কলঙ্ক দিতে চাও। তাঁকে ওঁরা নিয়ে গিয়ে-

ছেন, বেশ করেছেন ; নইলে তোমরা তাঁর কি অবস্থা করতে, তা তোমাদের ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এতকাল যা হবার হয়েছে, এখন আর আমরা এ সব হতে দিচ্ছি নে।"

বুড়া গাঙ্গুলী মহাশয় এতক্ষণ কোন কথাই বলেন নাই। যুবকের এই তেজের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন "তা হলে এ গ্রামে আমাদের কথা থাক্‌বে না? তোমরাই কর্ত্তা হয়ে বস্‌বে না কি?"

যুবক বলিল "আমরা কর্ত্তা হতে চাইনে; আপনারা ন্যায়-মত যা করবেন, আমরা ঘাড় পেতে তা স্বীকার করব; কিন্তু আমরা অন্যায়ের প্রশ্রয় দেব না।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন "তা হ'লে বাপ-বেটায় ঝগড়া আরম্ভ হবে দেখ্‌ছি।"

চণ্ডী বাবু সেই যে গোড়ায় দুই একটী কথা বলিয়াছিলেন, তাহার পর এতক্ষণ কিছু বলেন নাই। তিনি গত রাত্রেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এবার লেখা-পড়া-জানা যুবকের দল শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে; তাহারা, যাহা উচিত তাহার জন্য লড়িবে। এখন যুবকদের মুখে সেই ভাবের কথা শুনিয়া তাঁহার সাহস হইল; তিনি বলিলেন "কার কথায় সমাজ চল্‌বে, তা বল্‌তে পারিনে; কিন্তু ছেলেরা যা বল্‌ছে, তার একটী কথাও ত অন্যায় নয়। গোরার স্ত্রীর সম্বন্ধে যে কথা বলা হোলো, আমি তার প্রতিবাদ করছি। আমি বল্‌ছি, তার কোন অপরাধ নেই; তার চরিত্র খুব ভাল ছিল, এ কথা আমিও সহস্র বার বল্‌তে পারি। কালু যে কাজ করেছে, তার জন্য তার বিশেষ দণ্ড হওয়া উচিত।

তা না করে, তাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করবার জন্য যে কথা হচ্ছে, আমি তার মধ্যে নেই। আমি কালুর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখব না। আমার দিদি যা করেছেন, বেশ করেছেন; নইলে সে হতভাগিনী আজ মেয়েটী নিয়ে যে পথে দাঁড়াত! আমার কথা আমি বল্‌লাম, এখন এর জন্য তোমরা আমাকে যা করতে চাও, করতে পার। গাঁয়ে দলাদলি ছিল না, এখন না হয় একটা দলাদলিই হবে। তোমরা কালুকে নিয়ে থাক, আমি সমাজে একঘরে হয়েই থাক্‌ব; তাতে আমার কোন আপত্তি নেই।”

যুবকেরা কোলাহল করিয়া উঠিল “কে চণ্ডী বাবুকে একঘরে করে, দেখা যাবে। আমরা সবাই ওঁর দিকে।”

শ্যামা ঠাকুরাণী রাগে অধীরা হইয়া বলিলেন “বেশ, আজ থেকে আমিই একঘরে। আমি আর তোমাদের কিছুর মধ্যে নেই! এত অপমান! যাদের বাপ-কাকাদের জন্মাতে দেখ্‌লাম, তারাই কি না সুমুখে দাঁড়িয়ে অপমান করে! ডেকে এনে অপমান করে! আচ্ছা দেখা যাবে, চণ্ডী মুখুয্যের কেমন তেজ!” এই বলিয়া শ্যামা ঠাকুরাণী বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন।

[৮]

"ওহে ঘটক, শুনেছ, ও-বাড়ীর বড়-গিন্নী কি এক কীর্ত্তি করে বসেছেন ?"

"সে কি আর শুন্‌তে বাকী আছে ছোট কর্ত্তা ! একেবারে একটা বেশ্যাকে এনে ঘরে তোলা। এমন ত কখন শুনিনি।"

অখিল পাল ঘাড় নাড়িয়া বলিল "সুধু একটা বেশ্যা নয় কর্ত্তা, সঙ্গে আবার একটা বার বছরের মেয়ে! মেয়েটা নিজের, না ব্যবসার জন্য জুটিয়ে নেওয়া, কে জানে ?"

"আরে, না হে না, মেয়েটা ঐ মাগীরই গর্ভজাত, তবে হ'তে পারে সেটা জারজ।"

পীতাম্বর ঘটক বলিল "জারজ যে, তার আর সন্দেহই নেই, নইলে অমন সুন্দরী হয়।"

"খুব সুন্দরী না কি ? কৈ, তা ত শুনিনি। তবে মাগীটা যে খুব সুন্দরী আর যুবতী, তা শুনেছি।"

অখিল পাল বলিল "আজ্ঞে, আমরাও কি আর চোখে দেখেছি, তাদের যে একেবারে পর্দ্দানশীন করা হয়েছে ; কারও কি দেখবার যো আছে—একেবারে অসূর্য্যম্পশ্যা !"

কথা হইতেছিল দেবীপুরের সাত-আনির জমিদার শ্রীযুক্ত মনোহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানায়। পীতাম্বর

ঘটক আর অখিল পাল, দুই জনই ছোট-কর্ত্তা মনোহর বাবুর মোসায়েব।

মনোহর বাবু বলিলেন "তাই ত হে, এখন কি করা যায় বল ত? এমন অনাচার, এমন জাতনাশের কাণ্ড ত চুপ করে বসে দেখা যায় না। এ কি আর গোপন থাক্‌বে? তখন—তখন যে দেশের মধ্যে মুখ দেখান যাবে না; একঘরে হ'তে হবে। সিধুটাকে ত বড় ভাল ছেলে ব'লেই জানি। লেখা-পড়া শিখেচে, সবগুলো পাশ দিয়েছে। ওদের সঙ্গে বিষয়-আশয় নিয়ে বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা থাক্‌লেও সিধুকে আমি বড়ই ভাল বাসতাম। সেও আমার খুব বাধ্য। যা শত্রুতা করে, সে ত ওর মা। সিধু কাজকর্ম্ম কিছুই দেখে না।"

ঘটক বলিল "যা বলেছেন কর্ত্তা, সিধু বাবু খুব ভাল ছেলে। এই আমরা যে সামান্য লোক, আমাদের সঙ্গেও দেখা হ'লে কেমন হেসে কথা বলেন, ছেলেপিলের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কর্ত্তাকেও খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন।"

"তা ত জানি হে! কিন্তু উপস্থিত এ ব্যাপারে সিধু যদি একটু শক্ত না হয়, তা হলে তার সঙ্গেই বা সম্বন্ধ রাখা যায় কি করে। আর তাও বলি, তুই এত বড় ছেলে, বয়সও প্রায় সাঁইত্রিশ আট-ত্রিশ হ'তে গেল; লেখা-পড়াও যথেষ্ট শিখেছিস্, বুদ্ধি-বিবেকটাও আছে; তুই এমন করে মায়ের আঁচল ধরে থাকিস্ কেন? যদ্দিন নাবালক ছিলি, ততদিন না হয় কথা ছিল না। এখন সাবালক হয়েছিস্, জমিদারীতেও নামজারি করিয়ে নিয়েছিস্; এখন নিজে

সব দেখ্ শোন্। তা নয়, মা যা বল্বে তাই করবে—সুধু সই করবার বেলায় তুই। এই যে তোর নাবালক অবস্থায় তোর মা বিষয় দেখেছে, তার একটা হিসাব-নিকাশ ত তলব করা উচিত ছিল। আমি ত সবই জানি; বড়-গিন্নী তুই হাতে টাকা জমিয়েছে। আরে, দশটা মেয়েও নেই যে, তাদের দিয়ে যাবি; সবই ত ঐ ছেলের। তবে আর এমন করিস্ কেন।”

অখিল পাল বলিল “এই এখন সে সব টাকা দেওয়ার মানুষ জুটেছে। তাদের দিয়ে সব লুটিয়ে দেবে। একটি পয়সা ত কাউকে দান করা নেই।”

“না হে অখিল, সে কথা বোলো না। বড়-গিন্নীর দান-ধ্যান আছে; গরীব-দুঃখীকে দেওয়া আছে; ক্রিয়া-কর্ম্মেও কৃপণতা করে না। তবে কি জান? সে আর কটা পয়সা। দাদা জমিদারীর আয় যা বাড়িয়ে দিয়ে গেছেন, তার তুলনায় বছরে দুহাজার পাঁচ হাজার দান-ধ্যান তেমন একটা বেশী কিছু নয়, কি বল ঘটক?”

পীতাম্বর ঘটক বলিল “তাতে আর সন্দেহ কি কর্ত্তা! সংসার ত আর তেমন বড় নয়; দু চার পাঁচ হাজার দান-ধ্যান কি আর এমন রাজার সংসারে একটা ধর্ত্তব্য। হাঁ, দান ত দান আমাদের এই ছোটকর্ত্তার। কাউকে কখন ‘না’ বলতে শুনলাম না; তা কেবা জানে পাঁচ শ, আর কেবা জানে পাঁচ হাজার।”

মনোহর বাবু হৃষ্টচিত্তে বলিলেন “তা যা বলেছ ঘটক, আরে টাকা কি আর সিন্দুকে তুলে রাখবার জন্যে; খরচের জন্যই টাকা।

আমি ত এই বুঝি। দশজনকে যদি এই পালনই না করলাম, তা হলে টাকা থেকে কার কি লাভ, কি বল হে ঘটক!"

পীতাম্বর বলিল, "আজ্ঞে তা বই কি। এই ত রাজার মত কথা।"

মনোহর বাবু বলিলেন "সে কথা মরুক গে। এখন কি করা যায় বল ত? এই দেখ সুবর্ণপুর থেকে কালাচাঁদ মুখুয্যে পত্র লিখেছে। যা লিখেছে, সে ত অতি ভয়ানক কথা। এই নেও চিঠিখানা ত একটু চেঁচিয়ে পড় ত হে অখিল!"

অখিল চিঠি লইয়া একটু উচ্চৈঃস্বরে পড়িল—

"প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদনমেতৎ

মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকিলেও আপনার নাম ও গুণগ্রামের কথা এত দূরস্থানে থাকিয়াও আমরা অবগত আছি। দেবীপুরের বিখ্যাত জমিদারবংশের যে আপনি অলঙ্কার, এ কথাও এ অঞ্চলের সকলেই জানে। সেই সাহসে নির্ভর করিয়াই আপনাকে আমার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা নিবেদন করিতেছি। মহাশয় ধনী, মানী, এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণকুলের শিরোমণি, আপনি কথাগুলি বিবেচনা করিয়া যাহা বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

এই সুবর্ণপুরের ৺ গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার সহোদর ভ্রাতা না হইলেও দূরসম্পর্কে আমার ভ্রাতা। আমি বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের বাড়ীতে প্রতিপালিত এবং তাঁহাদেরই পরিবারভুক্ত। আমার সেই দাদামহাশয় মাস-ছয়েক পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি জীবিতকালে সংসারের কোন কাজকর্ম্মই

দেখিতেন না ; সর্ব্বদাই উদাসীন ভাবে বিমর্ষ অবস্থায় থাকিতেন। তাহার কারণ তিনি কখনও প্রকাশ না করিলেও আমি তাঁহার পরিবারভুক্ত এবং তাঁহার ভ্রাতা, আমি বিশেষ অবগত ছিলাম ; কিন্তু পরিবারের গ্লানি ও কলঙ্কের কথা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে, বুঝিয়া তিনিও চুপ করিয়া গিয়াছেন, আমিও কোন উচ্চবাচ্য করি নাই। এক্ষণে যখন কথাটা যে ভাবেই হউক প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখন বলিবার আর বাধা নাই। আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, দাদা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর চরিত্র ভাল নহে ; এমন কি তাঁহার যে কন্যাটি আছে, সেটীও তাঁহার ঔরসজাতা নহে, এ কথাও তিনি জানিতেন। আমি সমস্ত জানিয়াও তাঁহার দিকে চাহিয়া কোন কথা বলিতাম না। তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হইবার পর তাঁহার স্ত্রী—আমার ভ্রাতৃবধূ বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন ; এমন কি বলিতে ঘৃণা হয় যে, তিনি মুসলমানের সংশ্রবেও ছিলেন। এ অবস্থায় আমি আর কতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারি। তাই এই কয়েকদিন পূর্ব্বে এক রাত্রিতে তাঁহাকে শাসন করিতে উদ্যত হইলে তিনি চীৎকার করিয়া পাড়ার লোক একত্র করিলেন। আপনার ভ্রাতৃবধূ শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বাবুর মাতা সে দিন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবুর বাড়ীতে ছিলেন। আমার ভ্রাতৃবধূর চীৎকার শুনিয়া তিনি এবং ঐ বাড়ীর ও পাড়ার অন্যান্য সকলে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে আপনার ভ্রাতৃবধূই প্রচার করিলেন যে, আমি আমার ভ্রাতৃবধূর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছি। আমার ভ্রাতৃবধূ কিছু বলিয়াছিলেন কি না, তাহা

আমি জানি না। তখন রাগের বশীভূত হইয়া উপস্থিত সকলেই আমাকে যতদূর লাঞ্ছনা করিতে হয়, তাহা করিলেন এবং এখনও চণ্ডীবাবু কয়েকজন ছেলে ছোকরাকে হাত করিয়া আমার সামাজিক নির্য্যাতন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমার প্রতি যে অত্যাচার ও অবিচার হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি না, কারণ তাহার সম্বন্ধে আপনি কি করিতে পারেন। আমার কথা এই যে, অমন স্ত্রীলোককে কেমন করিয়া আপনাদের পরিবারের মধ্যে স্থান দিলেন। আপনারা ব্রাহ্মণ-প্রধান, সমাজেও আপনাদের প্রতিষ্ঠা আছে। প্রকাশ্য ভাবে এ প্রকার কার্য্য করিলে কি আপনারা সমাজে স্থান পাইবেন? ইহার জন্য আপনাদিগকে নিশ্চয়ই সামাজিক অবমাননা সহ্য করিতে হইবে। আপনাকে এ বিষয়ে অবগত করান কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াই সমস্ত বিবরণ জানাইলাম। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি হয় করিতে পারেন। অন্যান্য স্থানে আমাদের সমাজের যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগকেও এ সংবাদ দিলাম; আপনাকেও জানাইলাম। যথা-কর্ত্তব্য করিবেন। নিবেদন ইতি

সেবক—

শ্রীকালাচাঁদ দেব শর্ম্মণঃ মুখোপাধ্যায়"

পত্রপাঠ শেষ হইলে মনোহরবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন "শুন্‌লে ত পত্র! সুধু আমাকেই লেখে নাই, আমাদের সমাজের অন্যান্য

স্থানের যাঁরা প্রধান ব্যক্তি, তাঁদেরও লিখেছে! সুতরাং বুঝতেই পারছ, ব্যাপার গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

পীতাম্বর ঘটক বলিল, "কিন্তু ছোটকর্ত্তা, আমি একটা কথা বুঝতে পারলাম না, আপনি এ-অঞ্চলের সমাজপতি বলেই আপনাকে কি এই পত্র লেখা হয়েছে?"

"এই শোন কথা! পত্রের ভাবটাই বুঝতে পারলে না হে! আমাকে সমাজে পতিত করবার ভয় দেখিয়েছে। নয়-আনি আর সাত-আনির জমিদারীই না হয় পৃথক, কিন্তু সামাজিক হিসাবে দেবীপুরের জমিদার বংশের বর্ত্তমান অভিভাবক যে আমিই। সিধু সমাজে কোন অন্যায় করলে সেটা যে আমারই কৃত বলে গণ্য হবে। তবে হাঁ, যদি ওদের সঙ্গে আমাদের সামাজিক সম্বন্ধও না থাকত, তা হলে না হয় বল্‌তে পারতাম যে, নয়-আনির সঙ্গে কোন বিষয়ে আমাদের সম্পর্ক নাই। কিন্তু তা কি বলবার যো আছে। আমিও ক্রিয়াকাণ্ডে ওদের বাড়ী যাই, ওরাও আসে। তারপর গ্রামের যাঁরা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁদের কথাও ত ভাবতে হয়। এতে জমিদারী চাল চলে না, এ সামাজিক কথা। এতে গরীব হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্যেরও যে মর্য্যাদা, আমারও তাই। সমাজে বড় ছোট নেই—সব সমান। অন্যায় করলে, সামাজিক অপরাধ করলে সকলকেই দণ্ড পেতে হবে, তা তিনি সিদ্ধেশ্বর চাটুয্যে মনোহর চাটুয্যেই হন, আর যিনিই হন। বুঝলে হে ঘটক?"

পীতাম্বর বলিল "আজ্ঞে, সে কথা ত ঠিক। তবে কথা কি

জানেন? আপনি হলেন এ অঞ্চলের এক প্রকার রাজা। আপনি একটা কথা বললে অস্বীকার করতে পারে, অমত করতে পারে, এমন সাধ্য এ-দিকের কোন লোকের নেই। আপনি যা করবেন, তাই চলে যাবে। কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে যে, আপনার হুকুম অমান্য করতে পারে।”

মনোহর বাবু বলিলেন “না হে, এখন দিন-সময় ভাল নয়। এখন সামাজিক ব্যাপারে আমার কথাই যে চলবে, তা আর হচ্চে না। এই পত্রেই শুনলে না, সুবর্ণপুরে এরই মধ্যে দুই দল হয়ে গিয়েছে। এখানেও যে তা না হতে পারে, কে বল্লে? তখন মনোহর চাটুয্যের পদ-প্রসার সম্মান কোথায় থাকবে।”

অখিল পাল বলিল “তা হলে কর্ত্তা কি করবেন।”

মনোহর বাবু বলিলেন “একবার সিধুকে ডেকে এনে এই পত্র-খানা দেখাই। তাতে সে কি বলে শোনা যাক। তার পর উপস্থিতমত যে ব্যবস্থা হয় করা যাবে। তবে মোট কথা বলে রাখছি, ঐ দুষ্টা স্ত্রীলোকটী আর তার মেয়েটীকে আমি কিছুতেই দেবীপুরের সীমার মধ্যে থাকতে দেব না। এত অনাচার আমা-দের বংশে কোন দিন সয় নাই, সইবেও না, এ কথা তোমাদের স্পষ্ট করে বলে রাখছি। কি বল হে ঘটক?”

ঘটক বলিল “আজ্ঞে তা বই কি। আপনিই হচ্ছেন ধর্ম্মের রক্ষক। আপনার মুখেই এ রকম কথা শোভা পায়।”

তখনই সিদ্ধেশ্বর বাবুকে সংবাদ দিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল।

[৯]

শ্রীযুক্ত মনোহর বাবুর আরও একটু পরিচয় দিতে হইতেছে। তিনি নয়-আনির-বর্ত্তমান জমীদার শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বাবুর খুড়া মহাশয়—পিতার খুল্লতাত-পুত্র। তিন পুরুষ পূর্ব্বে দেবীপুরের জমিদারী দুই ভাগে বিভক্ত হয়; একভাগ নয়-আনি, আর এক-ভাগ সাত-আনি। এ প্রকার বিষয়-বিভাগের কারণ, কি তাহা আমরা জানি না। এই বিভাগের পর হইতে এতদিন নয়-আনি সাত-আনি কখন মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে নাই; দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মামলা-মোকদ্দমা সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। মামলা মোকদ্দমা না হইলে বোধ হয় দেবীপুরের জমিদারীই চলে না; কারণে অকারণে গোলযোগ চলিয়া আসিতেছে; কোন পক্ষই কাহারও কাছে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিতে চাহেন না; সুতরাং আদালতে যাওয়া ব্যতীত কোন দিনই গত্যন্তর থাকে না।

সিদ্ধেশ্বর বাবুর পিতা সর্ব্বেশ্বর বাবু যখন মারা যান, তখন সিদ্ধেশ্বর বাবু নাবালক ছিলেন। সেই সময়ের ম্যানেজার বাবু বিশেষ চেষ্টা করিয়া জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসে যাইতে দেন নাই—সিদ্ধেশ্বর বাবুর মাতা রমাসুন্দরী দেবীই নাবালকের অভিভাবক হইয়া জমিদারী-কার্য্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা

করেন। সে সময় সাত-আনির মনোহর বাবু নয়-আনির ক্ষতি করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেন ; কিন্তু দুই চারিটা ব্যাপারের পরেই বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার দাদা সর্বেশ্বর চাটুয্যের অপেক্ষা রমাসুন্দরী এক-কাটি বেশী ; জমিদারী শাসনে রমাসুন্দরী মনোহর বাবুকে এক হাটে বেচিয়া আর এক হাটে কিনিতে পারেন, সুতরাং মনোহর বাবু ছোট-খাট বিবাদ বিসংবাদ করিলেও গুরুতর বিপক্ষতাচরণ করিতে কখনও সাহসী হন নাই।

এদিকে রমাসুন্দরীর সহিত মনোহর বাবুর জমীদারী-সংক্রান্ত গোলযোগ থাকিলেও মনোহর বাবুর সাংসারিক বিপদ-আপদে তিনি বিনা আহ্বানে উপস্থিত হইতেন ; সাত-আনিতে কোন ব্যাপার-বিধান উপস্থিত হইলে ও-বাড়ীর বড়-গিন্নী আসিয়া কর্তৃত্ব না করিলে কিছুতেই কার্য্য সুসম্পন্ন হইত না। ইহার আরও একটী কারণ ছিল। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে, যখন মনোহর বাবুর একমাত্র পুত্র হরিহরের বয়স দশ বৎসর, সেই সময় মনোহর বাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হয়। রমাসুন্দরী সে সময় মনোহর বাবুকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন ; কিন্তু পুত্র হরিহরের মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বিবাহ করিতে অসম্মত হন এবং সে অসম্মতি রক্ষা করিয়াই আসিয়াছেন। বাড়ীতে আত্মীয়া কোন স্ত্রীলোক না থাকায়, কোন ব্যাপার-বিধান উপস্থিত হইলে রমাসুন্দরীকেই সমস্ত ব্যবস্থা করিতে হইত ; হরিহরের দিকেও তাঁহাকেই দৃষ্টি রাখিতে হইত। তাহার পর হরিহর গ্রামের বিদ্যালয় হইতে বিশেষ প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলি-

কাতায় অধ্যয়ন করিতে যায়। সিদ্ধেশ্বর তখন এম-এ ও বি-এল্ পাশ করিয়া দেশে আসিয়া ব'সয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হরিহর আই-এ পাশ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়িতেছিল; এবং দাদা সিদ্ধেশ্বরের অনুরোধেই সে ইংরাজী সাহিত্যে 'অনার' লইয়াছিল। হরিহর সিদ্ধেশ্বরকে সত্যসত্যই সহোদর বড় ভাইয়ের মত ভক্তি করিত। সে যাহার-তাহার কাছেই বলিত, তাহার দাদা দেবতার মত; তাঁহার জমিদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করাই ভুল হইয়াছে।

আর একটী কথা বলিলেই মনোহর বাবু সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলা হইয়া যায়। রমাসুন্দরী এতকাল সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়াও মনোহর বাবুর সামাজিক সমস্ত ব্যাপারেই যোগ দিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু বিগত এক বৎসর হইতে তিনি আর সাত-আনির বাড়ীতে যান না। কারণ, এতকাল পরে মনোহর বাবুর এই বৃদ্ধ বয়সে চরিত্র-দোষ ঘটিয়াছে। তাঁহার বাড়ীর একটী দাসী কেমন করিয়া তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্রী হইয়া উঠিয়াছে। মনোহর বাবু যদি একটু সাবধানে কার্য্য করিতেন, তাহা হইলেও হয় ত এ ব্যাপার রমাসুন্দরী বা অপরের কর্ণগোচর হইত না; কিন্তু তিনি সেই দাসীটিকে এতদূরই প্রশ্রয় দিয়াছেন যে, সে এখন বলিতে গেলে গৃহস্বামিনীর আসনই অনেকটা দখল করিয়া বসিয়াছে। এ অবস্থায় রমাসুন্দরী সাত-আনির সহিত ঘনিষ্ঠতা রাখিতেই পারেন না। মনোহর বাবুর পুত্র হরিহর কলিকাতায় অধিকাংশ সময় থাকিলেও অবকাশ সময়ে বাড়ীতে আসিয়া সমস্তই বুঝিতে

পারিয়াছিল। কিন্তু সে কি করিবে? তাহার মনের দুঃখ, ক্ষোভ ও ঘৃণা সে মনেই দমন করিত এবং অবকাশ-সময়ে বাড়ীতে না আসিলে পিতা দুঃখিত হন, এই জন্যই অল্প কয়েক দিনের জন্য আসিত; কিন্তু বাড়ীতে তাহার মন টিকত না; সে তাহার দাদার আদেশেই নিজেকে গঠিত করিয়া তুলিতেছিল।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে দিনের কথা বলা হইয়াছে, সেই দিন অপরাহ্নকালে খুড়ামহাশয়ের আহ্বানে সিদ্ধেশ্বর সাত-আনির বাড়ীতে আসিতেছিলেন। ঘাট পার হইয়াই দেখেন, হরিহর বাগানের মধ্যে ভ্রমণ করিতেছে। হরিহর সিদ্ধেশ্বরের আগমন জানিতে পারে নাই দেখিয়া, সিদ্ধেশ্বর তাহাকে ডাকিলেন। দাদার ডাক শুনিয়াই হরিহর ফিরিয়া দেখে তাহার দাদা বৈঠকখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সে তখন তাড়াতাড়ি সিদ্ধেশ্বরের নিকট আসিয়া বলিল "কি, দাদা যে আজ এদিকে বেড়াতে এসেছ?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "ঠিক বেড়াতে নয়, কাকাবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"বাবা ডেকেছেন। কেন? কিসের জন্য?"

"তা ত কিছু ব'লে পাঠান নেই, সুধু বলেছেন আজ বিকেলে যেন একবার অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা করি। মল্লিনপুরের একটা বিষয় নিয়ে মামলা হচ্ছে; সে-দিন আদালতে মামলা উঠেছিল; তাতে কাকাবাবুর পক্ষ থেকে দিন নেওয়া হয়েছে; আপোষে মিটমাট হবার সম্ভাবনা আছে, এই কথাই তাঁরা বলেছেন। বোধ হয় সেই আপোষের কথা বল্‌বার জন্যই আমাকে ডেকে পাঠিয়ে-

ছেন। আমার কিন্তু ভাই, এ সব মোটেই ভাল লাগে না। তুমি বেশ আছ; কোন গোল নেই, পড়াশুনা করছ। আমার যে তারও যো নেই। এদিকের যে কয়টা পাশ, তা হোয়ে গেল; কাজেই বাড়ী এসে বস্‌তে হলো। এখন দিন রাত সুধু জমিদারী আর মামলা-মোকদ্দমা। আমার ভয়ানক কষ্ট হয়েছে। এই এখনই কাকাবাবুর কাছে গেলে, তিনি রায় ফয়সালা দলিল-দস্তাবেজ সব বার করে ফেলবেন, আর আমি মধুসূদনের নাম ডাকৃতে থাকব।"

হরিহর হাসিয়া বলিল, "সেই জন্যই ত দাদা, আমি যাকে-তাকে বলি, আমার দাদার জমিদারের ঘরে জন্মগ্রহণ করা ঠিক হয় নাই। আমি সত্যি বলছি দাদা, তোমার ঠিক মানাতো গরীব গৃহস্থের ঘরে। তুমি একটা পাড়াগাঁয়ের স্কুলে এই ষাট সত্তর টাকার হেড মাষ্টারী করতে—তোমার পক্ষে সেইটে ঠিক হতো। তা নয়, একেবারে কিনা দেবীপুরের নয়-আনির হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা!"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "কি করব ভাই, ছোট একটা ভাই থাকত, তার উপর সব ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে লেখাপড়া নিয়েই থাকৃতে পারতাম। মা বুড়ো হয়েছেন; তিনি আর কতদিন এই সব জঞ্জাল পোয়াবেন; তবুও আমার রকম দেখে তিনি এখনও বেশী কিছু চাপ আমার উপর দেন না। কিন্তু আমারও ত ভাবা উচিত। কি বল ভাই?"

হরিহর বলিল "দেখ দাদা, আমি তোমায় ঠিক বলছি, তুমি

আমাকে যতই সদুপদেশ দাও না কেন, আমাকে বিদ্বান, মহানু-ভব করবার জন্য যতই বক্তৃতা কর না কেন, আমি কিন্তু দেবী-পুরের জমিদারই হব—তেমনি দাঙ্গাবাজ, তেমনি মামলাবাজ, আর যদি ক্ষমা কর দাদা, তা হ'লে বলি তেমনি ফেরেববাজ।"

"ওরে মূর্খ, যাঁদের কথা বলছিস্, তাঁরা যে তোর আমার পূজনীয় ব্যক্তি; তাঁদের সম্বন্ধে অমন অশ্রদ্ধাভরে কথা বলা কি ভাল ?"

"এই দেখ, তুমি আবার উপদেশ জুড়ে দিলে। কিন্তু বল না দাদা, আমি যা বল্লাম তা সত্য কথা কি না ?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "সব সময়ই কি সত্য কথা বলা চলে ?"

"তা হ'লে তুমি বল্‌তে চাও কি, আমি মিথ্যা কথা বলি ?"

"মিথ্যা বল্‌তে বল্‌ছিনে; আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, অপ্রিয় সত্য যথাসম্ভব না বলাই ভাল। তাতে কোন লাভ হয় না। যাক্ গে সে কথা, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর তর্ক করব না। যাই কাকাবাবুর মহাভারত শুনে কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচি।"

হরিহর বলিল, "আরে, বাবা এখনও বৈঠকখানায় আসেন নি; অন্দরেই আছেন। তোমার এত তাড়াতাড়ি কি ? তোমার মমিনপুর নিয়ে ত আর মাথাব্যথা পড়ে নাই। এস, এই বাগানের মধ্যেই একটু বসি। তোমাকে ত সব সময় পাইনে।"

"কেন পাবে না, আমার ওখানে গেলেই পার, যখন তোমার খুসী।"

"কেন যাইনে তা বল্‌ব। তুমি শুনেছি সব সময় লেখা-পড়া নিয়ে থাক, আমি গিয়ে তোমার বেদ-বেদান্তের মধ্যে একটা গোল পাকিয়ে তুল্‌তে ভয় পাই। তাই যেতে পারিনে।" এই বলিয়া হরিহর সিদ্ধেশ্বরকে টানিয়া লইয়া ঘাসের মাঠের পার্শ্বে একখানি বেঞ্চে বসাইল।

সিদ্ধেশ্বর বসিয়া বলিলেন "এখন বল্‌ তোর যত কথা আছে।"

হরিহর বলিল "হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়েছে। দেখ দাদা, কা'ল আমি আমাদের চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সেরীটা দেখ্‌তে গিয়েছিলাম। ভারি বেবন্দোবস্ত দাদা! বাবা সময় পান না, তোমারও মনোযোগ নেই। ওটা একটা বার-ভূতের কাণ্ড হয়েছে। ওষুদ-পত্রের জন্য তোমরা দুই সরিকে যে টাকা দেও, তা যথেষ্ট। কিন্তু কেউ ত দেখে না; সে সব ওষুদ উড়ে যায়। আমি বলি কি, তোমরা ডিস্পেন্সেরীটার উন্নতি কর। এই ত মামলা-মোকদ্দমায় কত টাকা খরচ করছ; তখন আর কোন ওজর হয় না। আমি বলি কি, একজন ভাল দেখে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন নিযুক্ত কর; আর 'আপ-টু-ডেট' যন্ত্রপাতি সব নিয়ে এস। সেই যে মান্ধাতার আমলের কুইনিন-মিক্‌সচার, আর ডায়েরিয়া পিল, তাতে আর এখন চলে না। আমি অবশ্য ঠিক বল্‌তে পারিনে, আমার মনে হয়, তোমরা দুই সরিকে যদি হাজার তিনেক টাকা দেও, তা হোলেই মোটামুটি যন্ত্রপাতি আস্‌তে পারে। আর একজন এসিষ্টান্স সার্জ্জনের মাইনে এই কত আর—ধর দেড়শো টাকা। তাঁকে যদি 'আউট-প্র্যাকটিস্‌' কর্‌তে দেওয়া যায়, তা হলে

দেড়শো টাকায় বেশ ভাল ডাক্তারই পাওয়া যায়। এই দেড়শো টাকা তোমরা ন-আনি সাত-আনি মিলে দিতে পার না?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "দেখ হরিহর, যন্ত্রপাতি কিনবার ঐ তিন হাজার টাকা, আর ডাক্তারেব মাইনে মাসিক দেড়শো টাকা, এ তুমি যদি বল, তা হলে আমিই দিতে পারি। কিন্তু, তা হ'লেই অমনি আগুন জ্বলে উঠ্‌বে। কাকা বাবু অমনি আপত্তি করে বস্‌বেন; বল্‌বেন, আমি বড়মানুষী দেখাচ্ছি, আমি তাঁকে অপমান করছি। বুঝেছ, এ যে ভাগের মা! এ মাকে গঙ্গায় দিতে পারে এমন ভগীরথ ত জন্মায় নি। এই সব জন্যই ত ভাই, আমি কিছু করতে পারিনে।"

হরিহর বলিল "দেখ দাদা, তোমার কিন্তু একটা ভারি অন্যায় আমি অনেক দিন থেকে 'মার্ক' করে আস্‌ছি। কথাটা বল্‌ব। এক-এক সময় কথা বল্‌তে-বল্‌তে যখন তোমার মনে হয় যে, তুমি তোমার সাত-আনির সরিকের ছেলের সঙ্গে কথা বল্‌ছ, তখনই তুমি 'তুমি' বলে কথা বল; আর যখন সে কথা ভুলে যাও, যখন তোমার মনে হয়, তোমার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বল্‌ছ, তখন 'তুই' বল। কেমন, ঠিক্ না? তার থেকে একটা নিয়ম করে ফেল এই যে, অতঃপর তুমি আমার সঙ্গে 'আপনি' বলে কথা বল্‌বে—যেহেতু আমি সাত-আনির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। কেমন?"

সিদ্ধেশ্বর হরিহরকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার পিঠে বালকের মত হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন "সত্যি ভাই, তুই

ঠিক ধরেছিস্। ঐ রকম একটা অন্যায় ভাব আমার মনে আসে বই কি। আজ তোর কাছে আমি অপরাধ স্বীকার করছি। এটা সত্যই আমার দুর্ব্বলতা। আমি এটা দূর করব। এখন থেকে আমি তোকে 'তুই' বলব; আমি ভুলে যাব, আমি নয়-আনি, আর তুই সাত-আনি।"

হরিহর সিদ্ধেশ্বরের বাহুপাশ ছিন্ন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আর শোন দাদা, আমিও তোমার সম্মুখে বলছি, আমার হাতে যখন এই জমিদারীর ভার আস্‌বে, তখন আমি এই নয়-আনি সাত-আনির বেড়া ভেঙ্গে দেব। তখন আবার সেই অনেকদিন আগের মত দেবীপুরের জমিদারী ষোল-আনি হবে, আর তুমি তার এক-মাত্র কর্ত্তা হবে; আর আমি তোমার পায়ের কাছে বসে শিক্ষা নেব—কিসে মানুষ হওয়া যায়। এ কি হ'তে পারে না দাদা! এ কি হবে না?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "ভাই, তুই ছেলেমানুষ; তোর প্রাণ এখন উন্নত; তাই তুই এ সব কথা বল্‌ছিস্। কিন্তু যখন এই জমিদারী তোর হাতে এসে পড়বে, তখন ভগবান না করুন, তোর হয় ত মন বদ্‌লে যাবে। এই তুই ত একটু আগেই বল্‌লি, তুই দেবীপুরের জমিদার হবার উপযুক্ত ব্যক্তি, আর আমি পাড়াগাঁয়ের স্কুল-মাষ্টার হবার যোগ্য।"

হরিহর বলিল "না, না, তুমি তামাসা রাখ। তুমি ঠিক বল ত, কি করলে নয়-আনি সাত-আনি পৃথক থাকে না।"

সিদ্ধেশ্বর হাসিয়া বলিলেন "একটা উপায় আছে এবং সেইটাই

একমাত্র উপায়। সেই উপায় অবলম্বন করে অনেক নয়-আনি সাত-আনির অস্তিত্ব লোপ হয়েছে। তাই যদি করতে পারিস, তা হলে হয়।"

"সেটা কি ?"

"শুন্‌বি সেটা কি ? আমি এক-দিকে লাঠি ধরি, আর তুই এক-দিকে লাঠি ধর। প্রকাণ্ড একটা দাঙ্গা বাধিয়ে দিই। দুই পক্ষের দশ বিশটা খুন, আর পঞ্চাশ ষাটটা জখম হোক। তারপর আর কি, মামলা আরম্ভ হোক—যাক্ হাইকোর্ট পর্য্যন্ত। নয়-আনি সাত-আনির যথাসর্ব্বস্ব আদালতে উকিলে ব্যারিষ্টারে ভাগ করে নিক। চার পাঁচ লাখ টাকা দুই সরিকের দেনা দাঁড়াক। শেষে হরিরামপুরের পাটের মহাজন সাহাজিরা এসে নয়-আনি সাত-আনি কিনে নিক্ ; তুই আর আমি সপরিবারে কুটীরবাসী হই, আমি স্কুল-মাষ্টারী করে যা পাই, তাই এনে তোদের খাওয়াই—দেবীপুরের নয়-আনি সাত-আনির অস্তিত্ব লোপ হয়। এই এক-মাত্র সনাতন উপায় ভাই ! নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

হরিহর বলিল "বাঃ ! তুমি ত দেখ্‌ছি এ বংশের ভারি শুভানু-ধ্যায়ী বন্ধু দাদা !"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "তুই পথের কথা জিজ্ঞাসা করলি ; আমি যা জানি, তাই তোকে বল্‌লাম। এ ছাড়া আর পথ নেই ! জানিস্ হরিহর, নয়-আনি সাত-আনির এ মনান্তর আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছি—এ সম্পত্তি এই রকম কামড়া-কামড়ি করিয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিতে থাকহ—বুঝিলি মূর্খ ! যাক্,

তোর সঙ্গে তর্ক করতে করতে তেষ্টা পেয়ে গেছে। এখন দেখি গে, কাকাবাবু বৈঠকখানায় এসেছেন কি না?"

হরিহর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "এই দেখেছ দাদা! তোমার সঙ্গে ভারি একটু বিশেষ কথা ছিল; এতক্ষণ তা ভুলেই গিছ্‌লাম।"

সিদ্ধেশ্বর হাসিয়া বলিলেন "ভারি বিশেষ কথা, অথচ সেইটেই ভুল। আচ্ছা ছেলে যা হোক্‌।"

"না দাদা, সত্যিসত্যিই একটা অতি গুরুতর পরামর্শ তোমার সঙ্গে আছে। আমি সন্ধ্যার পর তোমার ওখানে যাব ব'লেই মনে করেছিলাম। দেখ, আমি সুবর্ণপুর থেকে—"

কথাটা আর সমাপ্ত হইতে পারিল না। মনোহর বাবু বৈঠকখানায় বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকিলেন "সিধু এসেছিস্‌। এদিকে আয়।"

হরিহরের আর তখন সে কথা বলা হইল না; সে তাড়াতাড়ি বলিল "চল দাদা, তোমার মমিনপুরের দলিল দস্তাবেজ শুনিগে, আর তোমার দুর্গতি উপভোগ করিগে। আমার সে কথা রাত্তিরে হবে, বুঝলে?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "সেই ভাল, তুই সন্ধ্যার পর আমার ওখানেই যাস্‌।" এই বলিয়া দুই জনে বৈঠকখানার দিকে গেল।

[১০]

সকালে-বিকালে আর কেহ থাকুক আর নাই থাকুক, পীতাম্বর ঘটক, আর অখিল পাল মনোহর বাবুর বৈঠকখানায় হাজির থাকিবেই ;—ঐ হাজিরা দেওয়া এবং মোসায়েবী করাই তাহাদের কার্য্য, অথবা তাহাদের জীবনোপায় ; মনোহর বাবু এই দুই জনকে মাসিক বেতন দিয়া থাকেন। ইহারা ষ্টেটের কোন কার্য্যই করে না, ছোট কর্ত্তার সকল কথায় 'আজ্ঞে হাঁ' বলাই ইহাদের কাজ।

সে-দিনও অপরাহ্নে যখন সিদ্ধেশ্বর ও হরিহর বৈঠকখানায় গেল, তখন মনোহর বাবু সেখানে যাইয়া বসিয়াছেন এবং এক পার্শ্বে ঐ দুইটী ধূমকেতু বসিয়া আছে। দুই বাবুকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা দুই জনই উঠিয়া করযোড়ে নমস্কার করিল— ভবিষ্যতে ইহাদের কাছেও ত চাকরী বজায় রাখিতে হইবে। তাহাদের দেখিয়াই মনোহর বাবু বলিলেন "সিধু, কতক্ষণ এসেছ বাবা!"

সিদ্ধেশ্বর কাকা-বাবুকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "এই আধঘণ্টা হোলো।"

মনোহর বাবু বলিলেন "আধঘণ্টা হোলো এসেছ, আর আমাকে খবর দেও নাই?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "আপনাকে আর খবর দিয়ে বিরক্ত করি নাই ; হরিহরের সঙ্গে বাগানে ব'সে গল্প করছিলাম।"

মনোহর বাবু বলিলেন "বেশ, বেশ, দাঁড়িয়ে কেন, বোস বাবা। হরিহর তুমিও বোসো, যেও না। তোমরা দুই ভাই-ই এখন উপযুক্ত হয়েছ, তোমরা যদি সব দেখে-শুনে কর, তা হ'লে ত আমি বাঁচি।"

সিদ্ধেশ্বর ও হরিহর এক পার্শ্বে উপবেশন করিলে, মনোহর বাবু বলিলেন "তোমার শরীর ভাল আছে ত বাবা! সুবর্ণপুর থেকে ফিরে আসার পরে এ কয়দিন দেখাই হয় নাই ; নানা কাজে অবসর করে উঠ্‌তে পারিনে। তাই আজ তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "শরীর ভালই আছে। আপনি এখন কেমন আছেন! সে বেদনাটা ত আর বুঝতে পারছেন না?"

মনোহর বাবু বলিলেন "আমার আর শরীর! বুড়ো মানুষ, এখন গেলেই হয়। তোমাদের রেখে যেতে পারলেই বাঁচি।"

পীতাম্বর কি এমন সময় কথা না বলিয়া পারে ; সে বলিল "কর্ত্তার ঐ এক কথা! এমন কি বয়স হয়েছে যে, ও সব অলক্ষুণে কথা মুখে আনেন। শত বৎসর পরমায়ু হোক!"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "ঘটক মশাই ঠিক বলেছেন। কাকা-বাবুর বয়স আর এমন কি হয়েছে। সাহেবেরা যে এই বয়সে বিবাহ করে ঘর-সংসার আরম্ভ করে—এই বয়সেই তারা প্রকৃতপক্ষে কাজ আরম্ভ করে থাকে।"

মনোহর বাবু হাসিয়া বলিলেন "তাদের কথা ছেড়ে দেও। তারা শীতপ্রধান দেশের মানুষ; তারপর স্বাস্থ্যের দিকে তাদের কেমন দৃষ্টি। তাই তারা সহজে শক্তিহীন হয় না। যাক্ সে কথা। দেখ বাবা সিদ্ধেশ্বর, অনেক দিন থেকেই বল্‌ব বল্‌ব করি,-কিন্তু বল্‌তে পারিনে। তোমরা হচ্চ একেলে শিক্ষিত যুবক। তোমরা কি মনে করবে, তাই ভেবে বল্‌তে পারিনে। এখন আমিই ত তোমাদের অভিভাবক; কাজেই আমাকেই সব দিক্ দেখ্‌তে হয়। এই দেখ, বৌমার অসুখ ত কিছুতেই সারল না; চিকিৎসা-পত্রেরও কোন ত্রুটীই করলে না। এক বৎসর কল্‌কাতায় রেখে ডাক্তার বদ্দি যা কিছু করতে হয়, সবই ত করে দেখ্‌লে। বৌমার ও-অসুখ আর সারবে না, এ বেশ বোঝা যাচ্ছে। তবে যে কয়দিন পরমায়ু আছে, সে কয়দিন তাঁকে কষ্ট ভোগ করতেই হবে। কিন্তু, তা ব'লে ত একেবারে সংসারের উপর উদাসীন হ'লে চলে না। তুমি ত কোন কাজকর্ম্মই দেখ না। তা, দেখ্‌তে ইচ্ছেই বা করবে কেন? পরিবারের এই অবস্থা; বিষয়কর্ম্মে মন লাগবে কেন? দুটা ছেলে-মেয়ে হোতো; তাদের মুখের দিকে চেয়ে শরীরে বল হোতো। এখন শুনছি, তুমি না কি পণ্ডিত রেখে বেদান্ত শাস্ত্র পাঠ করছ?"

সিদ্ধেশ্বর নতমুখে বলিলেন "আজ্ঞে, পাঠ আর কৈ হচ্চে, অমনি একটু নাড়াচাড়া করি মাত্র।"

মনোহর বাবু বলিলেন "ঐ ত বাবা! এখন কি তোমার বেদান্ত পড়বার সময়। ও সব সন্ন্যাসীর শাস্ত্র। ও-সব পড়ো না বাবা!

তোমার মা ত কিছুই দেখ্‌বেন না ; আমার সঙ্গে যে দুটো পরামর্শ করা, তাও তিনি ইদানীং ছেড়ে দিয়েছেন। আরে বাবা, জমিদারী নিয়ে গোলমাল, ও সরিকে সরিকে হয়েই থাকে—আবহমানকাল চলে আস্‌ছে। কি বল হে ঘটক !"

ঘটক সপ্রতিভ ভাবে বলিল "সে ত ঠিক কথা! সৃষ্টি থেকেই সরিকি-বিবাদ আছে।"

মনোহর বাবু বলিলেন "তবেই দেখ, তাতে ত আর সাংসারিক ভালমন্দের কথাবার্ত্তার আলোচনায় দোষ নেই। তোমার মা না হয় চোখ বুজেই আছেন ; আমি ত আর তা পারিনে। অত বড় নয়-আনির বিষয়টা যে উড়ে যাবে, বাপ-পিতামহের নাম লোপ হবে, এ দাঁড়িয়ে দেখি কি করে তাই বল। সেই জন্যই বল্‌ছি বাবা, তুমি আর একটা বিবাহ কর। বৌমার যদি একটা ছেলে, নিদেন পক্ষে একটা মেয়েও থাকত, তা হলে তোমাকে এমন অনুরোধ করতাম না। নিজে যা করিনি, সে কাজ করতে তোমাকে অনুরোধ করতাম না। কিন্তু তোমার ত সে অবস্থা নয় ; পিতৃ-পিতামহের জলপিণ্ডের ব্যবস্থা ত পুত্রকে করতে হবে। শাস্ত্রের কথা আর তোমাকে কি বলব ; তুমিই আমাকে কত শাস্ত্র শিখাতে পার। শাস্ত্রে ত এ অবস্থায় দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহের ব্যবস্থা আছে। কি বল হে ঘটক ?"

ঘটক বলিল "সে আর বল্‌তে। বড়বাবু তা কি আর জানেন না ?"

মনোহর বাবু বলিলেন "সেই জন্যই বলি, আর কালবিলম্বের

দরকার নেই। শীঘ্রই একটা সদ্বংশজাতা সুস্থ-শরীরা মেয়ে দেখে কাযটা শেষ করে ফেল। তোমার যদি মত হয়, তা হলে আমিই না হয় একদিন ও-বাড়ী গিয়ে বড় বৌ ঠাকুরুণকে সমস্ত বলে শুভ-কার্য্যের ব্যবস্থা করে আসি।”

সিদ্ধেশ্বর এ কথার কোনই উত্তর দিলেন না, নতমস্তকে চুপ করিয়া রহিলেন।

তখন মনোহর বাবু বলিলেন “আরও একটা কথা। কথাটা আমার মুখ থেকে শোনা ভাল শোনায় না; কিন্তু আমি ছাড়া তোমার হিতাকাঙ্ক্ষীই বা কে আছে? তুমি এখনও ছেলেমানুষ; তোমার যৌবন কাল। পড়েছ ত অক্ষয় দত্তের চারুপাঠ—যৌবন বিষম কাল। পাপরূপ পিশাচ কোন্ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করে মনোমন্দিরে প্রবেশ করে তা বলা যায় না। এ উপদেশ ত আর তোমাকে দিতে হবে না? কিন্তু কি করি বল; আমার দুর্ভাগ্য, তাই বল্‌তে হচ্চে। শুনলাম তোমার মা নাকি সুবর্ণপুর থেকে একটী সুন্দরী বিধবা নষ্ট-চরিত্রা যুবতীকে এনে ঘরে তুলেছেন। এটা কি তাঁর পক্ষে ভাল হয়েছে? যে দুর্লক্ষ্য সূত্রের কথা বল্‌ছিলাম, তা ত তোমার মা ঘরে ডেকে এনেছেন। দেখ, মানুষের মন না মতি। কখন কি হয়, কেউ বল্‌তে পারে না। বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, সচ্চরিত্র বল, সব যুবতীর মোহিনী মায়ায় ভেসে যায়, এ কথা ত মান? মানুষ ত কোন ছার, স্বয়ং যিনি মহাদেব, তাঁরও ধ্যানভঙ্গ হয়েছিল। তার পর সেই বিধবাটি কুলটা, অসচ্চরিত্রা। সে যে তোমাকে প্রলুব্ধ করতে পারবে না, এ কি তুমি হলফ

করে বলতে পার? তোমার মা নিতান্ত অবিবেচনার কাজ করে-ছেন। বলে না, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী! তোমার মায়েরও তাই হয়েছে! আমার পরামর্শ শোন বাবা; সেই কুলটাকে এখনই বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দাও গে। আগুণ আর ঘি একসঙ্গে কখন রাখতে নেই—এ শাস্ত্র-বচন—অকাট্য।"

সিদ্ধেশ্বর এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন; কিন্তু এখন তাঁহাকে কথা বলিতে হইল। তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন "সুবর্ণপুরের গোরাচাঁদ মুখুয্যের স্ত্রী যে অবস্থায় পড়েছিলেন, তাঁর উপর যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার হয়েছিল, তা শুন্‌লে কাকা-বাবু, আপনার হৃদয় গলে যাবে। তিনি অতি সচ্চরিত্রা; তাঁর পাষণ্ড অভিভাবক, দূর-সম্পর্কের দেবর তাঁর উপর পশুর মত অত্যাচার করেছিল। সুবর্ণপুরের ব্রাহ্মণেরা তাঁকে পথের ভিখারিণী করবার ব্যবস্থা করেছিল। এই দেখে মা তাঁকে আর তাঁর মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন। আমি যতদূর শুনেছি, তাতে গোরাচাঁদ মুখুয্যের বিধবা পত্নী অতি সচ্চরিত্রা, একেবারে দেবী বল্‌লেই হয়। আপনি যদি তাঁকে একবার দেখেন, তাঁর মলিন মুখ দেখে আপনি নিশ্চয়ই কাতর না হয়ে থাকতে পারবেন না। তিনি সেই অত্যাচারের পর আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, মা তাঁকে সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।"

মনোহর বাবু বলিলেন "আমার কাছে কিন্তু অন্য রকম রিপোর্ট এসেছে। ও স্ত্রীলোকটীর অভিভাবক কালাচাঁদ মুখুয্যে আমাকে যে পত্র লিখেছে, এই সেই পত্র। তোমাকে সেই পত্র

দেখাবার জন্যই ডেকে এনেছি।" এই বলিয়া তিনি কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রখানি সিদ্ধেশ্বরের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন "পড়ে দেখ, কি লেখা আছে।"

সিদ্ধেশ্বর পত্রখানি খুলিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিলেন, হরিহরও সেই সঙ্গে পত্রখানি পড়িল। পড়া শেষ হইলে সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "পত্রে যা লেখা আছে, তার এক বর্ণও সত্য নয়। আমি নিজে সেখানে উপস্থিত ছিলাম; আমি নিজের চক্ষে সব দেখেছি। কালু মুখুয্যে নিজের সাফাইয়ের জন্য এই মিথ্যা কথা বানিয়েছে।"

হরিহর বলিল "দাদা, এ সম্বন্ধে আমিও একখানি পত্র পেয়েছি, সেই কথাই তোমাকে বল্‌তে যাচ্ছিলাম; বাবা তোমাকে ডাক্‌লেন তাই তোমাকে কিছু বলতেও পারলাম না, পত্রখানাও দেখাতে পারলাম না।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "কে তোমাকে পত্র লিখেছে হরিহর?"

হরিহর বলিল "এঁর বাড়ী ঐ সুবর্ণপুরেই। ইনি এবার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে সংস্কৃত অনারে ফার্ষ্ট ক্লাসে ফার্ষ্ট হয়েছেন।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "তুমি রামনাথ ঘোষালের কথা বলছ। হাঁ, রামনাথও সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। তাদের বাড়ীও মুখুয্যে-পাড়ায়। ছেলেটি খুব ভাল; যেমন পণ্ডিত, তেমনই বিনয়ী, আবার তেমনই তেজস্বী। আমার সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। রামনাথ কি লিখেছে?"

হরিহর তাহার পিতার দিকে চাহিয়া বলিল "রামনাথের চিঠি-খানা আপনার কাছে পড়ব কি বাবা।"

মনোহর বাবু ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিলেন "বেশ, পড়, শোনা যাক্, সে কি তোমাকে জানিয়েছে।"

হরিহর তখন তাহার পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া সিদ্ধেশ্বরকে দিতে গেল; বলিল "দাদা, তুমিই চিঠিখানা পড়ে শোনাও।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "না, তুমিই পড়।"

হরিহর পড়িল—

"ভাই হরিহর

বাড়ী পৌঁছিয়া আমাকে পত্র লিখিতে চাহিয়াছিলে, সে কথা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছ। আমিই স্মরণ করাইয়া দিলাম। তোমার শরীর কেমন আছে লিখিও। অবকাশ-সময় বৃথা নষ্ট করিও না; তোমাকে আগামী বৎসরে ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর শীর্ষস্থানে দেখিতে চাই। এত করিয়া বলিলাম, ইংরাজীর সঙ্গে সংস্কৃতেও অনার নেও; তুমি সে সাহস পাইলে না। আমি কিন্তু বলিতেছি, তুমি যদি এখনও সংস্কৃতে অনার নেও, তাহা হইলে ইংরাজী ও সংস্কৃত দুই বিষয়েই উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিবে; আমাদের মাতৃভাষারও গৌরব বৃদ্ধি হইবে; তোমার বংশেরও মুখ উজ্জল হইবে।

তোমার দাদা শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বাবুর সঙ্গে এখানে দেখা

হইয়াছিল। তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা ছাত্র, তাহা অনেক দিন হইতেই জানিতাম; কিন্তু তিনি যে এমন মহানুভব, নিরহঙ্কার ব্যক্তি, তাহা জানিতাম না। তাঁহার সহিত কথা বলিয়া, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া, সর্ব্বোপরি তাঁহার মহত্ত্ব ও চরিত্রবল দেখিয়া আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি; এবং বুঝিতে পারিয়াছি, এমন দেবোপম ভ্রাতার সাহচর্য্য লাভের সৌভাগ্যই তোমার চরিত্রকে এমন মাধুর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সর্ব্বাংশে তোমার দাদার উপযুক্ত ভ্রাতা হও।

যে কথা লিখিবার জন্য এই পত্রের অবতারণা, তাহা কিন্তু এখনও বলা হয় নাই। আমাদের গ্রামের ৺গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপারের বিবরণ বোধ হয় তোমার দাদার নিকট শুনিয়াছ। এমন পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় যে ভদ্রসমাজে হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। এ ব্যাপারের বিশেষ বিবরণ তোমাকে জানাইতে আমি লজ্জিত হইতেছি; বোধ হয় তোমাকে লিখিবারও প্রয়োজন নাই, কারণ তোমার দাদা সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই সকল কথা বলিবেন। তবুও যে ঐ বীভৎস ব্যাপারের উল্লেখ তোমার কাছে করিতেছি, তাহার বিশেষ কারণ আছে। শুনলাম সেই নরপশু কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায় আত্মদোষ-ক্ষালনের জন্য এবং সমস্ত অপরাধ সেই নিরপরাধা, সাধ্বী, গোরাচাঁদ বাবুর সহধর্ম্মিণীর উপর আরোপ করিয়া, তোমার পিতাকে এবং তোমাদের সমাজের

অন্যান্য স্থানের প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট পত্র লিখিয়াছে ; এবং যিনি বা যাঁহারা তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সমাজে লাঞ্ছিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছে। আমি গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেশী ; আমি তাঁহার বিধবা পত্নীকে বুদ্ধি পড়িয়া অবধি দেখিয়া আসিতেছি। আমি বলিতেছি, তাঁহার চরিত্রে কখন কোন দোষ স্পর্শ করে নাই ; কালাচাঁদের আরোপিত সমস্ত কথা মিথ্যা। তুমি জান, আমি কখন মিথ্যা কথা বলি না ; আমার কথায় বিশ্বাস করিও। তোমাকে এ কথা লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি তোমার পূজনীয় পিতৃদেবকে আমার এই পত্রখানি দেখাইবে ; তাহা হইলে তিনি অপর পক্ষের কথা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবেন। তোমার দাদা এবং তাঁহার মাতাঠাকুরাণী যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, নিরপরাধা বিধবাকে সামাজিক নির্য্যাতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিয়াছি, তোমাদের বংশ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে। তোমার পিতৃদেব বর্ত্তমান সময়ে সেই বংশের প্রধান ব্যক্তি ; সুতরাং তিনিও প্রকৃত ঘটনা অবগত হইলে মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন।

তোমার অবগতির জন্য আরও একটা কথা লিখিতেছি। এই ব্যাপার লইয়া আমাদের গ্রামেও মতান্তর হইয়াছে ; আমরা অর্থাৎ যুবকদল স্থির করিয়াছি যে, আমরা কালাচাঁদের সহিত কোন প্রকার সামাজিক সংস্রব রাখিব না ; এবং যে উপায়েই

হউক তাহার ন্যায় নরপিশাচকে এ গ্রাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিব। শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর বাবুর মাতুল শ্রীযুক্ত চণ্ডীবাবুও আমাদেরই মতাবলম্বী। গোরাচাঁদ বাবুর স্ত্রী ও কন্যাকে আশ্রয় দানের জন্য যদি তোমার দাদাকে ওখানে কোন প্রকার সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমরাও সে নির্য্যাতনের অংশ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম ; এবং আমি তোমাকে বলিতেছি, এ অঞ্চলের অনেক স্থান হইতে আমরা সহানুভূতি লাভ করিব। এ কথাটা তোমার দাদাকে অবশ্য অবশ্য জানাইও। ভগবান তাঁহার সহায় হইবেন। ইতি।

সোদরাভিমানী

শ্রীরামনাথ দেবশর্ম্মণঃ

পত্র পাঠ শেষ হইলে মনোহর বাবু বলিলেন "দুই পক্ষেরই কথা শুনিলাম। ইহার মধ্যে কোন্ পক্ষের কথা বিশ্বাসযোগ্য, তাহা বিবেচনার বিষয়।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "বিবেচনার বিষয় কিছু আছে বলে ত আমার মনে হয় না, কাকা-বাবু! সে রাত্রির ঘটনা ত আমার চক্ষের সম্মুখে ঘটেছিল ; সুতরাং তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমিই আছি। তারপর ঐ বিধবার চরিত্র যে নির্ম্মল ছিল, কেহ কখন তাঁর সম্বন্ধে একটী কথাও বলে নাই, এ কথাও আমি সকলের কাছেই শুনেছি। আর এই রামনাথ ছেলেটীও সেই কথারই সমর্থন করছে। রামনাথ অতি ভাল ছেলে, খুব সত্য-

বাদী। এ অবস্থায় আমরা যা বল্‌ছি, তাই যে বিশ্বাসযোগ্য, সে বিষয়ে কি আরও বিবেচনার প্রয়োজন আছে। আরও দেখুন, এই সমস্ত কথা যদি আমরা না শুন্‌তুম, তা হ'লে কি সেই বিধবাকে আমরা বাড়ী নিয়ে আসি। জেনে-শুনে নষ্টচরিত্রা কাউকে কি কেহ কখন বাড়ীতে স্থান দেয়।"

মনোহর বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আচ্ছা, ধরে নেওয়া গেল যে, তোমরা যা বল্‌ছ তাই সত্যি, এবং এই কালাচাঁদ মুখুয্যে যা লিখেছে, তা সমস্তই মিথ্যা, তা হ'লেও ত গোল মেটে না বাবা!"

"তা হলে আর কি গোল থাকল কাকা-বাবু!"

"কি গোল, তা শুন্‌বে। তোমরা যা বল্‌ছ, তাই যদি সত্যি হয়, তা হলে সেই রাত্রিতে কালাচাঁদ যে তার ভ্রাতৃবধূর সতীত্ব নষ্ট করেছে, এ কথায় ত কোন সন্দেহ নাই। কি বল হে ঘটক?"

পীতাম্বর ঘটক বলিল "সে ত অতি ঠিক কথা।"

সিদ্ধেশ্বর বিনীত ভাবে বলিলেন "আপনার সঙ্গে তর্ক বা আলোচনা করে ধৃষ্টতা দেখান আমার উচিত নয়। তবুও, কথাটা যখন উঠল, তখন বল্‌তে হয়, এই প্রকার পাশব অত্যাচারে কি সত্যসত্যই কোন সতী সাধ্বী রমণীর সতীত্ব নষ্ট হয়?"

"তুমি তা হলে কি বল্‌তে চাও?"

"আমি এই নিবেদন করতে চাই যে, এতে কোন রমণীর সতীত্ব নষ্ট হয় না। রমণী অসহায়া, অবলা; তার এমন সামর্থ্য নেই যে, বল প্রকাশে আত্মরক্ষা করে। তা হ'লে তার কি

অপরাধ? বনের হিংস্র পশুর হাতে যে কত লোক আহত হয়; একেও কি সেই পর্য্যায়ে ফেলা কর্ত্তব্য নয়?"

"তা হ'লে, তোমাদের নূতন আইন-অনুসারে এই কথা মেনে নিতে হচ্চে যে, কেহ যদি জোর করে কোন স্ত্রীলোকের সহিত অবৈধ অভিগমন করে, তা হলে সে স্ত্রীলোককে অসতী বলা যেতে পারে না; তাকে অনায়াসে ঘরে তুলে নেওয়া যেতে পারে; তার সঙ্গে,—এই তোমরা যেমন করছ, তেমনি আচার-ব্যবহার করা যেতে পারে; তাতে সমাজের কোন মর্য্যাদার হানি হয় না। আচ্ছা, আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি বাপু! স্ত্রীলোকের প্রতি এই প্রকার অত্যাচার এই প্রথম হোলো, না প্রায় অনেক সময়ই হয়ে থাকে?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "এই প্রথম কেন, খবরের কাগজে এ রকম অত্যাচারের কথা ত প্রায় সর্ব্বদাই পড়তে পাওয়া যায়।"

"এখন বল ত, সেই সকল রমণী, যারা এই ভাবে অত্যাচারিত হয়েছে, তারা কোথায় স্থান পায়? আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের কোন স্থানের কোন সমাজে, অর্থাৎ কোন হিন্দু সমাজে, কোন ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ সমাজে, সুধু তাই বলি কেন, জল আচরণীয় কোন শ্রেণীর মধ্যে কখন এমন স্ত্রীলোকের গ্রহণের কথা শুনেছ?"

সিদ্ধেশ্বর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "আজ্ঞে না, তা শুনি নেই, কিন্তু শোনা উচিত ছিল।"

"তা হ'লে বাপু, যা কখন শোন নাই, যা কোন সমাজে কখন

হয় নাই, তুমি কি তাই করতে চাও? আর চাও-ই বা কি, তুমি ত দেখ্‌ছি, তাই করে বসেছ।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "আজ্ঞে, তাই করে বসেছি। এই শ্রেণীর অত্যাচারগ্রস্তা অসহায়া রমণীর সতীত্ব নষ্ট হয়েছে বলে আমার ধারণা নয়; তাই আমি আমার মায়ের আদেশে গোরাচাঁদ মুখুয্যের নিরপরাধা, অসহায়া, সতী, সাধ্বী বিধবা পত্নীকে আমাদের গৃহে স্থান দিয়েছি। সুধু স্থান দিই নাই; দাসীর মত তাঁকে রাখি নাই; তাঁকে সম্মানের আসন দিয়েছি; তাঁর সঙ্গে অসঙ্কোচে আহার-ব্যবহার করছি; এ কথা গোপন করবার কোন প্রয়োজন দেখ্‌ছি নে।"

মনোহর বাবু উত্তেজিত হইয়া বলিলেন "তা হ'লে তুমি তোমার পিতৃ-পিতামহের ব্যবস্থা মান্‌তে প্রস্তুত নও? তুমি স্বেচ্ছাচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছ?"

সিদ্ধেশ্বর ধীর ভাবেই বলিলেন "আমি একে স্বেচ্ছাচার বলে মনে করিনে; এই প্রকার অসহায়া রমণীকে আশ্রয় দেওয়া, তাকে সমাজ-বহিষ্কৃত না করে দেওয়া আমি কর্ত্তব্য মনে করি; তাই আমি করেছি।"

"বেশ, হিন্দু সমাজে যা কখনও হয় নাই, তাই যদি তুমি করতে চাও, অনায়াসে করতে পার; কিন্তু জেনে রেখো, এর ফল বড় বিষম হবে। শেষে হাহাকার করতে হবে। আমি তোমার মত ম্লেচ্ছ হই নাই, হোতেও পারব না; আমাদের সমাজে যা কখন চলে নাই, তুমি তাই চালাতে যাচ্ছ। বেশ, চেষ্টা করে দেখ। আমি

বলে রাখ্‌ছি, এ বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা নয়,—এ সমাজের কথা। দেবীপুরের নয়-আনি দেশের সমাজপতি নয় যে, যা ইচ্ছা তাই সমাজে চালাবে। আমিই তোমার এই কাজে বাধা দেব। আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সামাজিক সম্বন্ধ রইল না। আমারই বা বল্‌ছি কেন, এই সনাতন ব্রাহ্মণ-সমাজ—এই হিন্দুসমাজ তোমাকে স্থান দেবে না, এ কথা জেনে রেখো। তুমি আমাদের সমাজের কেউ নও। এত দিন সব সয়েছি, এখন একবার দেখে নেব, তোমার কতখানি শক্তি, কত প্রতাপ! তোমাকে ভাল বলে আমার বিশ্বাস ছিল; কিন্তু এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি, তুমিও অধঃপাতে গিয়েছ। একটা কুলটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের রূপ দেখে তুমি গলে গিয়েছ। তোমার কু-অভিসন্ধি আমি বেশ বুঝতে পেরেছি!"

সিদ্ধেশ্বর এতক্ষণও বসিয়া ছিলেন; কিন্তু তাঁহার চরিত্রের উপর এই কুৎসিত আক্রমণে তিনি আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না; উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "মনে রাখবেন, সিদ্ধেশ্বর চাটুয্যে মনোহর চাটুয্যে নয়! বেশ, যা আপনি পারেন করবেন। নয়-আনিকে বিপন্ন করবার জন্য সাত-আনি এতকাল চেষ্টার ত্রুটী করে নাই; তার ফলও সকলে দেখেছে। আপনিও করুন। আপনি আমার অনিষ্ট-চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই, এখনও ভাল করে করুন। তবে এই কথা বলে যাচ্ছি, আমি আপনার অনিষ্ট-চেষ্টা করব না, করতে পারিনে—এতে যে হরিহর রয়েচে! ওর যে অনিষ্ট হবে, তা আমি সইতে পারব না। নইলে শোধ নিতে আমিও

জানি। কিন্তু তা করব না—হরিহরের মুখের দিকে চেয়ে আমি সমস্ত নীরবে সহ্য করব। কিন্তু বলে যাচ্ছি, নয়-আনির সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি যায় যাবে—অসহায়া নিরপরাধা বিধবাকে আমরা ত্যাগ করব না।" এই বলিয়া সিদ্ধেশ্বর বৈঠকখানা হইতে বেগে বাহির হইয়া গেলেন।

মনোহর বাবু রাগে ফুলিতে লাগিলেন; মুখের উপর কথা বলিয়া একটী যুবক তাঁহাকে অপমান করিয়া গেল, তাঁহার ক্ষমতা তুচ্ছ করিয়া গেল, ইহাও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইল। তখনই চাকরদের ডাকিয়া এই উদ্ধত যুবককে যথোচিত শাস্তি দিতে সাহসী হইলেন না; এ অপমান তাঁহাকে বাক্‌শক্তি-বিরহিত করিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি হরিহরকে বলিলেন "হরিহর, তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, নয়-আনির সঙ্গে তুমি কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে পারবে না—ঐ ম্লেচ্ছটার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ নাই। এ অপমানের শোধ যদি আমি না নিতে পারি, রমাসুন্দরী আর সিদ্ধেশ্বরকে দিয়ে যদি আমার পায়ে ধরাতে না পারি, তা হলে আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান নই,—তা হলে আমি মনোহর চাটুয্যে নই। যাও, তোমরা সবাই এখন চলে যাও। আমাকে উপায় চিন্তা করতে দাও।"

হরিহর ও মোসায়েবগণ নীরবে উঠিয়া গেল।

[১১]

সিদ্ধেশ্বর সাত-আনির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যখন পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার উগ্র ভাব কমিয়া গিয়াছে। তাঁহার তখন মনে হইল, কাজটা বড়ই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। কাকা-বাবু পূজনীয় ব্যক্তি; কথাগুলা তাঁর সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া বলা হয় নাই। তিনি না হয় রাগের বশে দশটা অন্যায় কথাই বলিয়াছিলেন; তাই বলিয়া তাঁহার মুখের উপর এমন কড় ভাষায় কথাগুলি বলা বড়ই খারাপ হইয়াছে। চুপ করিয়া চলিয়া আসিলেই হইত। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল, অন্য কথা হইলে ত তিনি অমন উত্তেজিত হইতেন না; তিনি যে তাঁহার চরিত্রের উপর কুৎসিত আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে কথা, নাঃ, কিছুতেই সহ্য করা যায় না—কিছুতেই না। কিন্তু, হরিহর কি মনে করিল! তাহার দাদা তাহারই সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার পিতাকে এমন অপমান-সূচক কথা বলিল, ইহাতে তাহার মনে নিশ্চয়ই বড় বেদনা লাগিয়াছে। সেই জন্যই মনে বড় কষ্ট হইতেছে! আহা, বেচারীর মা নাই, পিতাও ঐ এক রকমের মানুষ! ছেলেটার বড়ই দুর্ভাগ্য! হয় ত কাকা-বাবু তাকে আমাদের বাড়ীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখতে নিষেধ ক'রে দেবেন। তাহা হলে তার কি অবস্থা হবে। না, না, রাগের বশে কাজটা সত্যসত্যই ভাল

করি নাই। লোকে নিন্দা করল, কি কুৎসা রটনা করল, তাতে এমন কি এল গেল যে, আমি আত্মহারা হয়ে পড়লাম। বেশ ধীরভাবে, কাকা-বাবুর সম্মান রক্ষা করে কথা কি বলা যেত না। এতে বড়ই অহঙ্কার প্রকাশ করা হয়েছে! কাজটা ভাল হয়; নাই সত্যসত্যই এ ব্যবহারের সমর্থন করা যায় না। ফিরে যাব না কি? গিয়ে কাকা-বাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলে কি ভাল হয় না? বৃদ্ধ হয় ত বড়ই কষ্ট বোধ করছেন। না? কাজ নাই ফিরে গিয়ে। বাড়ী যাই, মাকে সমস্ত কথা বলি; তিনি যদি ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন, তখন তাই করা যাবে।

এই রকম নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সিদ্ধেশ্বর বাবু বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং বরাবর বাড়ীর মধ্যে যাইয়া মায়ের ঘরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তাঁহার মাতা ও মানদা সেই ঘরে বসিয়া কি কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। মানদার সম্মুখে এ কথা উত্থাপন করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়, মনে করিয়া তিনি ফিরিবার চেষ্টা করিতেই তাঁহার মাতা বলিলেন "কিরে সিধু, এলি, আবার ফিরে যাচ্ছিস যে; ও-বাড়ী গিয়েছিলি। তোর কাকা-বাবুর সঙ্গে কি কথা হোলো? মমিনপুরের সেই গোলমাল সম্বন্ধে কি বলে এলি?"

সিদ্ধেশ্বর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "মমিনপুর সম্বন্ধে কোন কথাই ত হোলো না; তিনি সে-জন্য আমাকে ডাকেন নাই; অন্য একটা কথা ছিল।" এই বলিয়াই তিনি চুপ করিলেন।

রমাসুন্দরী বলিলেন "অন্য এমন কি কথা যে, তোকে

তাড়াতাড়ি ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। ও কি রে, তোর মুখ যেন ভার-ভার বোধ হচ্ছে! কি হয়েছে, বল্ ত? তোকে ত এমন কখন দেখিনি।"

সিদ্ধেশ্বর একটু হাসিয়া বলিলেন "না, তেমন কিছু নয়।"

"তেমন নয় ত কেমন?"

"এখন থাক্ না, আর এক সময়ে শুন মা!"

"কেন, মানদা এখানে রয়েছে বলে কি তোর কথা বল্তে সঙ্কোচ বোধ হচ্চে? তা, ওর সামনে কথা বল্তে হানি কি? ও যে এখন আমাদের সুখ-দুঃখের ভাগী রে!"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "এখন থাকই না মা! এমন কিছু গুরুতর কথা নয় যে, এখনই না বললে চলছে না।"

মানদা বলিলেন "দিদি, আমি না হয় উঠে যাই; আমার সম্মুখে কথা বলতে হয় ত আপত্তি আছে।" এই বলিয়া মানদা উঠিতে গেলেন। রমাসুন্দরী তাঁর হাত ধরিয়া বসাইয়া বলিলেন "না, না, তুমি যাবে কেন।"

মানদা বলিলেন "দিদি! তুমি বুঝতে পারছ না। আমার ঠিক মনে হচ্ছে, আমার সম্বন্ধেই কথা হয়েছে; তাই উনি আমার সম্মুখে বলতে চাচ্ছেন না। আমি তখনই বলেছিলাম দিদি, এ পোড়ামুখীকে তুমি স্থান দিও না; তোমার ভাল হবে না। ঠিক তাই হয়েছে। আমি বলছি, আমারই কথা নিয়ে কাকা-ভাইপোতে মনান্তর হয়েছে। নইলে ওঁর মুখ ত এমন মলিন এ কয়দিন দেখি নি।"

রমাসুন্দরী রোষভরে বলিলেন "হয়ে থাকে, হয়েছে। তাতে তোমার ভয় কি? কেমন সিধু! এই কথাই হয়েছে বুঝি।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "হাঁ, এই সম্বন্ধেই কথা। তা আমি একেবারে স্পষ্ট শুনিয়ে দিয়ে এসেছি।"

"বেশ করেছিস্! তার জন্য ভয় কি? আচ্ছা চল্, কি কি কথা হোলো শুনিগে।" এই বলিয়া রমাসুন্দরী সিদ্ধেশ্বরকে লইয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন; মানদা অধোমুখে ভাবিতে লাগিলেন।

পার্শ্বের ঘরে যাইয়া সিদ্ধেশ্বর আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা মায়ের কাছে বলিলেন; একটী সামান্য কথাও বাদ দিলেন না। অবশেষে বলিলেন "দেখ মা, কাকা-বাবুকে এত শক্ত কথা বলা বোধ হয় ভাল হয় নাই। বাইরে বেরিয়ে আমার কিন্তু মনে বড় কষ্ট হতে লাগল। তাই ত, বুড়া মানুষ, পূজনীয় ব্যক্তি; রাগের সময় তাঁকে অনেক রূঢ় কথা বলে ফেলেছিলাম। একবার মনে করলাম, ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তার পরেই মনে হোলো, না, বাড়ী যাই, সব কথা তোমাকে বলি। তাই শুনে তুমি যদি ক্ষমা প্রার্থনা করতে বল, তা হলে যাব। তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে যাব না। আর ত কিছু নয় মা, ঐ হরিহরের জন্যই আমার মনে কষ্ট হচ্চে। তার সুমুখে তার পিতাকে অপমানসূচক কথা বললাম; সে হয় ত মনে বড় ব্যথা পেয়েছে।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "না, তুমি কোন অন্যায় কথা বল নাই।

আমার সঙ্গে যদি কথা হোতো, তা হোলে ওর চাইতেও শক্ত কথা শুন্‌তে হোতো। এই শক্ত কথার জোরেই তোমার কাকা-বাবুর হাত থেকে তোমার বিষয় আমি এতকাল রক্ষা করে এসেছি।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "আর কোন কথা নয় মা, তাঁর চরিত্রের উপর কটাক্ষ করাটা বোধ হয় আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই!"

রমাসুন্দরী বলিলেন "হাঁ, অসঙ্গত হোতো, যদি তিনি তোমার এমন নির্ম্মল চরিত্রের উপর সন্দেহ প্রকাশ না করতেন। তাঁর কথার উপযুক্ত উত্তর তুমি দিয়েছ। কিন্তু একটী কথা বাবা, তুমি নয়-আনির জমিদারের মত বল নাই।"

"কি কথাটা মা?"

"তুমি যে বলে এসেছ, তিনি যত পারেন, তোমার অনিষ্ট চেষ্টা যেন করেন, আমি তুমি সে সব নীরবে সহ্য করবে। এইটে জমিদারের মত কথা হয় নাই, তবে সিদ্ধেশ্বর চাটুর্য্যের মত কথা হয়েছে বটে। বাবা, তুমি ত বেশী জান না, ঐ মনোহর বাবু কত রকমে যে আমাদের অনিষ্ট চেষ্টা করেছেন, তা বলা যায় না; কিন্তু আমি তা একেবারে সুদের সুদ তস্য সুদ সমেত ফিরিয়ে দিতে পেরেছিলাম বলেই এ জমিদারি রক্ষা করতে পেরেছি। তা বেশ, তুমি নীরবই থেক। মনে করেছিলাম, তুমি এখন উপযুক্ত হয়েছ, তোমার হাতে সব সমর্পণ করে এখন ধর্ম্ম-কর্ম্ম করব। কিন্তু, দেখছি, তা আরও কিছুদিন হবে না—হয় ত মোটেই হবে না;—এই নয়-আনির বিষয় আর সম্মান রক্ষার জন্য নানা কাণ্ড করতে-করতেই আমায় জীবন শেষ হবে। তা হোক, তাতে আমার মনে

একটুও দুঃখ হবে না। অনাথা অসহায়া বিধবার সম্মান রক্ষার জন্ম আমি সব করব। মনোহর চাটুর্য্যে দেখ্‌তে পাবে যে, এই বুড়ো বয়সেই আমি তাকে সাত-ঘাটের জল খাওয়াব। সমাজের ভয় তুমি কোরো না সিধু! জান না, কল্‌কাতার কোন্‌ একজন বড়মানুষ যুবক তার মাকে বলেছিল 'মা, জাত-জাত কি বলছ? জাত আমার এই বাক্সের মধ্যে।' বল্‌তে অবশ্য কষ্ট হয়, কিন্তু না বলেও পারছিনে সিধু, এখন জাত তোমার খাজানা-ঘরের লোহার সিন্দুকের মধ্যে। আগের মত—বেশী আগেরও নয়, আমরা ছেলে বেলায় যেমন দেখেছি, তেমনিও যদি সমাজের অবস্থা হোতো, তা হলে ভয়ের কারণ ছিল; কিন্তু, এখন আর সে ভয় নেই। তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না যে, টাকায় এখন সব হয়। শাস্ত্র-বিধান এখন আর নাই, এখন সুধু আছে টাকা! সমাজ কৈ? বিধি-ব্যবস্থা মানে কয়জন? সুধু তর্ক করবার সময়, আত্মপক্ষ সমর্থন করবার সময় লোকে শাস্ত্রের দোহাই দেয়, শ্লোক দেখায়; কিন্তু পদে-পদে তারা শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করছে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ, সকলেরই ঐ দশা! এমন সমাজ, এমন প্রতারণাপূর্ণ সমাজ যদি তোমাকে ত্যাগ করে, তবে ত দুঃখের কোন কারণ নেই। এ সমাজে থাকাই পাপ! সুধু মিথ্যার রাজত্ব। তার পর শোন বাবা, যে কারণে ওঁরা তোমাকে সমাজের ভয় দেখাচ্ছেন, সে কারণটাকে আর তুচ্ছ করলে চল্‌বে না। তোমরা লেখাপড়া জান, তোমরা বিদ্বান হয়েছ, তোমরা অনেক পড়াশুনা করেছ; আমি সে সব কিছুই জানিনে; কিন্তু আমি বল্‌তে পারি, মানদার মত মেয়েকে যে সমাজ

গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, সে সমাজের মনুষ্যত্ব নেই—সে সমাজের আর পবিত্রতার জ্ঞানই নেই। তুমি বল্‌বে, তাঁরাও বলেছেন যে, এত কালের মধ্যে এমন অবস্থায় অত্যাচারগ্রস্থা স্ত্রীলোককে তাঁহারা সমাজে স্থান দেয় নাই। তাঁরা পূজনীয়; তাঁদের আমি অসম্মান করছি নে। কিন্তু তাঁরা কি কাজটা ভাল করেছেন? এই শ্রেণীর অসহায়া, নিরপরাধা সতী রমণীর চক্ষের জলেই আমাদের সমাজের এই দুর্দ্দশা হয়েছে; তাদের অভিসম্পাতেই আমাদের হিন্দুসমাজের এমন অধঃপতন হয়েছে। তুমি সেই ভ্রম সংশোধনের ভার নিয়েছে বাবা, তোমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি যদি এজন্য যায়, তা হলেও তোমার কোন দুঃখ থাকবে না; একজন অনাথা বিধবাকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি তুমি চির-দারিদ্র্যকে বরণ করে নেও, তার বাড়া গৌরব আর নেই। এই ভেবেই আমি তোমাকে এ কাজে নামিয়েছি। মানদাকে সমাজে চালাতে হবে; তার জন্য যদি দলাদলি হয়, হোক্। সবাই তোমার পক্ষে আস্‌বে, এ আশা তুমি করতে পার না, আমিও করি না। তোমার কাকা-বাবুর মত ভণ্ড ধাম্মিক দেশে অনেক আছেন; তাঁরা বাধা দেবেনই। কিন্তু, তুমি তোমাকে অসহায় মনে কোরো না। তোমার মত যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন, যাঁরা সত্যনিষ্ঠ, যাঁরা কর্ত্তব্যপরায়ণ, বাঙ্গালা দেশে তেমন লোকেরও অভাব নেই। তাঁরা তোমার সহায় হবেন। মনোহর চাটুর্য্যে তোমার সঙ্গে আহার বন্ধ করবেন, কিন্তু মনোহর অপেক্ষাও মনোহর কত মহাত্মা তোমার পক্ষ অবলম্বন করবেন। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি জয়-যুক্ত হবে। আর

আগেও বলেছি, এখনও বল্‌ছি, এই বুড়ো বয়সে, মরবার পূর্ব্বে এই উপলক্ষে মনোহর চাটুর্য্যেকে আবার একটু ভাল করে শিক্ষা দিয়ে যেতে পারব।”

মানদা পার্শ্বের ঘরে এতক্ষণ ছিলেন। সিদ্ধেশ্বর ধীরে ধীরে তাঁহার মাতার সহিত কথা বলিয়াছিলেন; মানদা তখন মোটেই কিছু শুনিতে পান নাই। রমাসুন্দরীও প্রথমে ধীর ভাবেই কথা বলিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি ক্রমে যত উত্তেজিত হইতে লাগিলেন, তাঁহার স্বরও উচ্চ হইতে লাগিল; মানদা তাঁহার শেষের কথাগুলি সমস্তই শুনিলেন। তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া এই দয়ালু পরিবার যে বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাহা আংশিক ভাবে তিনি পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু সে বিপদ যে এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিবে, দুই সরিকের বিবাদাগ্নি এমন প্রচণ্ডভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে, এতদূর তিনি ভাবিয়া উঠিতে পারেন নাই। এখন রমাসুন্দরীর কথা শুনিয়া তিনি ভীতা হইলেন; তাঁহার বড়ই অনুতাপ উপস্থিত হইল। কেন তিনি ইঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই সাধু পরিবারকে বিপন্ন করিলেন। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ধীরপদবিক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া, যে কক্ষে মাতাপুত্রের কথোপকথন হইতেছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। রমাসুন্দরীর বক্তব্য তখন শেষ হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বর যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় মানদা প্রবেশ করিয়া কহিলেন “দিদি! তোমাদের সকল কথা আমি শুনতে পাই নাই, কিন্তু তুমি শেষে যে কথাগুলো বল্‌লে, তাতে বেশ বুঝতে পারলাম,

এই হতভাগীকে বাড়ীতে স্থান দিয়ে তোমরা মহা বিপদে পড়েছ। আমার জন্য তোমরা ঘরে-ঘরে ঝগড়া-বিবাদ করতে বসেছ। তোমার পায়ে ধরে বলছি দিদি, অমন কাজ কোরো না। আমরা কোথাকার কে, যে আমাদের জন্য তোমরা এমন বিপদ ইচ্ছা করে ডেকে নিলে। আমাদের বিদায় করে দেও। আমাদের অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে।" এই বলিয়া মানদা রমাসুন্দরীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন।

রমাসুন্দরী ব্যস্তভাবে মানদাকে তুলিয়া বলিলেন "আমরা কি করব না করব, আমাদের কি হবে না হবে, তা আমরা বুঝি। তার জন্য তোকে ব্যস্ত হতে হবে না। তোকে কি পথের ভিখারিণী করে দেবার জন্য আমি নিয়ে এসেছি মানদা। সে কথাও মনে করিস্ না। কে আমাদের কি করতে পারে, আসুক না। সমাজের কথা বলছিস্? যে সমাজ তোকে পথের বার করবার ব্যবস্থা দিতে পারে, সে সমাজ আমরা চাইনে। এই আগে সেই কথাই সিধুকে বল্‌ছিলাম। তোকে আমরা ছেড়ে দেব না, তোকে কোথাও যেতে দেব না। সমাজের এই অন্যায় অত্যাচার, এই গর্হিত ব্যবহার নিবারণ করবার জন্যই তোকে আমরা নিয়ে এসেছি। এই নয়-আনির বাড়ীর শেষ ইঁটখানা দাঁড়িয়ে থাক্‌তে আমরা তোকে কোথাও যেতে দেব না। তোর অপরাধ কি? তুই উপলক্ষ মাত্র। তোকে উপলক্ষ করে আমার পুত্র সিদ্ধেশ্বর একটা কাজের মত কাজ করতে প্রস্তুত হয়েছে। বলেছি ত, এতে আমাদের মধ্যে দুটো দল হবে। তাতে আমাদের দল যে

একেবারে নিতান্ত ছোট হবে, তা আমি মনে করি না। বেশ ত, হোক না দুটো দল। তাতে আমরা ভয় পাচ্ছি না। দেবীপুরের নয়-আনির ঘরে যথেষ্ট টাকা মজুত ছিল; আমিও চেষ্টা করে তা বাড়িয়েছি, কমাই নাই। সেই টাকা এই সৎ কার্য্যে ব্যয় হোক। আমাদের সংসারের অবস্থা ত দেখ্‌ছ। বৌমার জীবনের আশা নেই। একটা ছেলে কি মেয়েও হোলো না। কবে যে সে চোখ বুজবে, তা বল্‌তে পারিনে। তার দেহত্যাগ হলে সিদ্ধেশ্বর যে কি করবে, তা আমি তার মা, আমি বেশ বুঝতে পেরেছি। এ নয়-আনির বংশে কেউ থাক্‌বে না—এ বংশ লোপ হবে। তখন এ জমিদারী, এত টাকা কি হবে? তাই ভগবান লোক এনে দিয়েছেন, বুঝেছিস্। এ সবই তাঁর খেলা। সেই খেলাই হোক না। মানদা ,তুই আমি হাজার চেষ্টা করলে, হাজার বাধা দিলেও সে খেলা বন্ধ হবে না। সে চেষ্টা করাও বৃথা। এই কথা মনে করে রাখিস্, আর তোকে কিছু বল্‌তে চাইনে। তুই মনে কিছু করিস্ না। তুই আমাদের আপনার জন হয়েছিস্; পর মনে হলে এমন করে তোকে বুকে তুলে নিতাম না।"

মানদার চক্ষু জলভরাক্রান্ত হইল। তিনি একবার সিদ্ধেশ্বরের সেই উদার, প্রশান্ত, ধীর, স্থির মুখের দিকে চাহিলেন; সে মুখে স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিঃ দেখিতে পাইলেন। তাহার পর রমাসুন্দরীর দিকে চাহিলেন; দেখিলেন জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী যেন স্নেহ-কোল বিস্তার করিয়া জগতের পাপী-তাপী অনাথ-অনাথাকে সেই বিশ্ব-ব্যাপী ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য সস্নেহে আহ্বান

করিতেছেন। মানদা তখন গললগ্নীকৃত বাসে রমাসুন্দরীর চরণে প্রণাম করিলেন। রমাসুন্দরী তাঁহাকে তুলিয়া বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। ধরাতলে স্বর্গের পবিত্র দৃশ্যের ক্ষণিক অভিনয় হইয়া গেল।

[১২]

সাত-আনির জমিদার শ্রীযুক্ত মনোহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ত্তব্য স্থির করিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না, এবং সে জন্য অধিক চিন্তাও করিতে হইল না। একটু পরেই পীতাম্বর ঘটক ও অখিল পালকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাহাদিগকে গ্রামের মধ্যে প্রেরণ করিলেন; এবং গ্রামে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান ব্যক্তি, তাঁহাদিগকে সেইদিন সন্ধ্যার পরই সাত-আনির বাড়ীতে উপস্থিত হইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন।

সন্ধ্যার পরই সভা বসিল; গ্রামের অনেকেই উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুক্ত মনোহর বাবু তাঁহাদের সম্মুখে কালাচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের পত্রখানি পাঠ করিয়া মত প্রকাশ করিলেন যে, এই পত্রের বিবরণ যে সত্য, তাহা তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কি কর্ত্তব্য, তাহাই অবধারণের জন্য তিনি গ্রামের সকলকে ডাকিয়াছেন।

যাঁহারা তাঁহার অনুগত ও আশ্রিত, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, সিদ্ধেশ্বর চাটুর্য্যেকে সমাজে অচল করিতেই হইবে; তবে তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জানান কর্ত্তব্য। তিনি যদি দশজনের কথার অবাধ্য হইয়া উক্ত স্ত্রীলোককে আশ্রয় দেন, তাহা হইলে

তাঁহার সহিত আহার-ব্যবহার ত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু যাঁহারা নয়-আনির অনুগত লোক, তাঁহারা বলিলেন যে, এ সম্বন্ধে নয়-আনির সহিত পরামর্শ না করিয়া তাঁহারা কোন মত প্রকাশ করিতে পারেন না।

মনোহর বাবু বলিলেন, "আমি এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য সিদ্ধেশ্বরকে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম। সে কিছুতেই ঐ স্ত্রীলোককে ত্যাগ করিবে না, বলিয়া গিয়াছে; এবং তৎপক্ষে আমাকেও যথেষ্ট অপমানসূচক কথা বলিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহাকে এই সম্বন্ধে পুনরায় জিজ্ঞাসার কোন আবশ্যকতাই আমি দেখিতেছি না। অপনাদের যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারেন। কিন্তু, আমি আপনাদিগকে স্পষ্ট বলিতেছি যে, অতঃপর আমি নয়-আনির সহিত কোন সামাজিক সংশ্রব রাখিব না, এবং আপনাদের মধ্যে যাঁহারা নয়-আনির সহিত আহার-ব্যবহার করিবেন, তাঁহাদের সহিতও আমার কোন সংশ্রব থাকিবে না। সমাজের মধ্যে এমন অন্যায় কার্য্যের প্রশ্রয় আমি দিতে পারিব না।"

নয়-আনি ও সাত-আনি উভয় পরিবারেরই পুরোহিত শ্রীযুক্ত রঘুদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, বিচক্ষণ ও প্রবীণ ব্যক্তি। গ্রামের মধ্যে আরও কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ যজমান তাঁহার আছে। তিনি শূদ্রের প্রতিগ্রহ করেন না; বেশ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। উভয় সরিকের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। তিনি অতি অল্পভাষী ব্যক্তি। তিনি বলিলেন "ছোট কর্ত্তা,আপনি ধনী ব্যক্তি,আপনি যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে

পারেন। আমি যজন-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ; আপনাদের দুই সরিকের পৌরোহিত্য আমরা পুরুষানুক্রমে করিয়া আসিতেছি। এখন অকস্মাৎ তাহারই একটী সরিকের কার্য্য ত্যাগ করিতে হইলে ব্যাপারটী সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া প্রয়োজন। বিনা অনুসন্ধানে কেবল একপক্ষের কথা শুনিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা কি যুক্তিসঙ্গত হইবে? আমি বলি, আমি ত ও-বাড়ীরও পুরোহিত; আমি যাইয়া বড় বাবুকে এবং বড় গিন্নীকে সমস্ত কথা নিবেদন করি; তাঁদের কি কর্ত্তব্য ও মন্তব্য, তাহাও শুনি এবং এ সম্বন্ধে আমার যা অভিমত, তাহাও তাঁহাদিগকে বলি। তাহার পর সমস্ত জানিয়া-শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইবে, তাহাই করা যাইবে।' এত তাড়াতাড়ি করিবার ত কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।"

মনোহর বাবু বলিলেন "আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি ও-বাড়ীতে গিয়ে সমস্ত জান্‌তে পারেন এবং তাহার পর আপনার কর্ত্তব্য স্থির করতে পারেন। কিন্তু, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলে রাখছি যে, আপনি যদি ভ্রান্তি-বশতঃ তাদের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আপনারা পুরুষানুক্রমে এ বংশের পুরোহিত হইলেও আপনাকে ত্যাগ করতে আমি বাধ্য হব। আমি যা স্থির করেছি, তা আর নড়চড় হবে না, এ কথা আমি বলেই রাখছি।"

এই বৈঠকে আর একটী ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ-এক-রকমের মানুষ। সংসারে তাঁহার কেহই নাই। কিঞ্চিৎ ব্রহ্মোত্তর আছে। তাহাতে যাহা আয় হয়, তাহাই তাঁহার সম্বল।

লোকটা কিন্তু প্রকাণ্ড নেশাখোর—গাঁজা ও সিদ্ধি তাঁহার নিত্য সহচর। অবশ্য এই নেশার খরচের জন্য তাঁহাকে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না; বরঞ্চ দুই-চারিজন নিঃস্ব নেশাখোর তাঁহারই দ্বারস্থ হয়। লোকটীর প্রধান গুণ এই যে, সে উচিত-বক্তা,—সে উচিত কথা বলিতে কাহাকেও ত্রুটী করে না। তাহার নাম শীতল ঠাকুর।

যখন পাড়ায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ দল বাঁধিয়া সাত-আনির বাড়ীতে আসিতেছিলেন, তখন পথের মধ্যে শীতল ঠাকুরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। এতগুলি ব্রাহ্মণ একসঙ্গে যাইতেছেন দেখিয়া তাহার মনে হইল নিশ্চয়ই তাঁহারা কোথাও নিমন্ত্রণে যাইতেছেন। সে জিজ্ঞাসা করিল "কি গো বাঁড়ুয্যে মশাই, দল বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? নিমন্ত্রণ পেকেছে না কি? কিন্তু তা হলে শীতল ঠাকুর বাদ যায় কেন?"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় বলিলেন, "না হে শীতল, এখনও নিমন্ত্রণ পাকে নাই বটে, কিন্তু বিশেষ বিলম্বও নেই। চল না, সাত-আনিতে, সব জান্‌তে পারবে।"

শীতল ঠাকুরের তখন বিশেষ কোন কাজ ছিল না; তাহার মনে হইল, এতগুলি ব্রাহ্মণ যখন সাত-আনিতে যাইতেছেন, তখন বোধ হয় অদূর-ভবিষ্যতে কোন একটা বৃষোৎসর্গ ব্যাপারের সম্ভাবনা হইয়াছে। যাক্, সঙ্গে গিয়েই দেখা যাক না। এই ভাবিয়া শীতল ঠাকুরও মনোহর বাবুর বৈঠকখানায় গিয়াছিল। সে চুপ করিয়া বসিয়া সমস্ত কথাই শুনিল। পুরোহিত মহাশয়

মত প্রকাশ করিবার পর নানা জনে সপক্ষে বিপক্ষে নানা কথা বলিতে লাগিলেন; কেহ বা শাস্ত্র-বচন তুলিয়া আসর গরম করিবার আয়োজন করিলেন, কেহ বা মস্তক সঞ্চালন পূর্ব্বক যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

শীতল ঠাকুর আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না; তাহার সর্ব্বাঙ্গ এই আলোচনায় জ্বলিয়া উঠিল। সে একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিল "মশাইরা একটু থামতে পারেন। এই শীতল ভট্টাচার্য্যও ত গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ; তার কথাটাও ত শুনতে হয়।"

কে একজন বলিল "তোমার আবার কথা! তুমি জান গাঁজা আর ভাঙ্গ।" শীতল ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিল "আরে বাবু, সুধু গাঁজা আর ভাঙ্গ জানব কেন, অনেক কথাই জানি। বলি, এই যে তোমরা 'জাত গেল', 'জাত গেল' বলে একটা হল্লা তুলেছ, তোমাদের লজ্জা করে না? আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা। আমি তোমাদের ন-আনি সাত-আনি—কারো বাগানের পাতাটুকু কেটেও ভাত খাইনে। ব্রহ্মোত্তর ভোগ,—কারো তোয়াক্কা রাখি নে। আমার কাছে সোজা কথা শোন। এই যে সিধু বাবুকে একঘরে করতে চাচ্চ, কিন্তু তার মত মানুষ তোমাদের এই দেবীপুরে—শুধু দেবীপুর কেন, আশপাশে দশখানা গাঁয়ের মধ্যে দেখাও দেখি। ও-সব বামনাইয়ের বড়াই এই শীতল ঠাকুরের সুমুখে করো না—নেশাখোর মানুষ—এই সভার মধ্যে সব ভেঙ্গে দেবে।"

মনোহর বাবু রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন "কি তুমি ভেঙ্গে দিতে পার শীতল? বলই না?"

শীতল বলিল "তা হলে বলে ফেলি। ঐ যে ও-পাড়ার তিনকড়ি চাটুর্য্যে তার ভাদ্রবধূকে নিয়ে আছে, সে কথা মশাইরা জানেন না? কৈ তাকে ত কেউ একঘরে করেন নাই! আর যিনি বড় উঁচু গলা করে তর্ক করছেন, বলব না কি—হাঁ বলব না কি, তর্করত্ন মশায়, আপনার গুণের কথা! এই শীতল ঠাকুরের হাত পৈতে দিয়ে জড়িয়ে ধরবার বৃত্তান্তটা! কেমন সত্যি কি না। বেশ ত, আগে এদের একঘরে করুন, তার পর ও-বাড়ীর সিধু বাবুর বিচার করা যাবে। সে বেচারী অপরাধ করেছে কি?—না একটা বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে একটা ষাঁড়ে আক্রমণ করেছিল; সিধুবাবু, তাকে বাজারে ঘর বেঁধে দিয়ে এই তোমাদের মত দশজন বকধার্ম্মিকের পথ খোলসা করতে না দিয়ে, তাকে আশ্রয় দিয়েছে। এই তার অপরাধ, কেমন! আরে সুবর্ণপুর কি আর আমি চিনিনে। আমি যখন-তখনই গিয়ে থাকি—আমার পিসি যে সুবর্ণপুরের বাঁড়ুয্যেদের বৌ—তা ত জান। আমি গোরাচাঁদকেও চিনতাম, কালু মুখু-য্যেকেও জানি। আমি ও-গাঁয়ের অনেকেরই হাঁড়ীর খবরও দিতে পারি। এই শীতল ঠাকুর গাঁজাই খাক আর সিদ্ধিই খাক, কারও মুখ চেয়ে কোন দিন মিথ্যা কথা বলে নাই। আমি এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারি, গোরা মুখুয্যের বৌকে কেউ কোন নিন্দে করে নাই; এখন যে করবে, তার জিভ খসে পড়বে।

তাকে আশ্রয় দিয়ে সিধু বাবু বাপের বেটার মত কাজ করেছে। বেশ করেছে।"

মনোহর বাবু আর নীরবে এই সকল কথা শুনিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন "ওহে শীতল, তোমাকে কেউ সাক্ষী দেবার জন্য ডাকেনি। এ গেঁজেলটাকে আবার কে জুটিয়ে নিয়ে এল। যাও হে, তুমি তোমার আড্ডায় যাও; ভদ্রলোকের মজ্‌লিসে, এ সব সামাজিক কথার মধ্যে তোমার মত অর্ব্বাচীন পাজীর স্থান নেই।"

শীতল লাফাইয়া উঠিল; চক্ষু দুইটি রক্তবর্ণ করিয়া বলিল "কি বল্‌লে ছোটকর্ত্তা, আমি পাজী, আমি অর্ব্বাচীন। তবে আর তোমাকেই বা ছেড়ে কথা বলি কেন? মনে করেছিলাম, তোমার গুণের কথা তোমার বাড়ীতে ব'সে আর তুলব না। পাজী যখন বলেছ, তখন এই সভার লোক বিচার করুক, কে বেশী পাজী, তুমি না আমি! তুমি যে সাত-আনির মালিক হয়ে অমন কর্ত্তাগিরি করে সিধু বাবুর জাত মারতে বসেছ, নিজের জাতের কথাটা ভেবেছ কি? ঐ যে সদীকে এখন রাজরাণী করেছ, দিন গেলে তার পাদক-জল খাও, তার তৈরী লুচি তরকারী খাও, তার পরিচয়টা জান। ঐ সদী বিধবা হলে কার আশ্রয়ে ছিল, জান? এই তোমারই চাকর ছলিম সর্দ্দারের। আমিই একদিন বেটাকে খড়ম-পেটা করেছিলাম,—গয়লার মেয়ে সদীর তাতে রাগ দেখে কে? ছলিম আমার ভয়ে আর ও-মুখো হলো না। সদী এসে তোমার বাড়ী দাসী হলো—এখন ত দেখছি

সে মনোহর চাটুয্যের ষোল-আনার মালিক হয়েছে। জাত যদি মারতে চাও, তা হলে আগে মার দেখি এই মনোহর চাটুয্যের, তার পর অন্য কথা। শীতল ঠাকুর পাজী! তোমরা সিধুবাবুর জাত মারতে কেমন পার, তা আমি দেখে নেব। এই সদী গয়লানীর কথাটা আমি যদি এই সমাজের গাঁয়ে গাঁয়ে প্রচার করে মনোহর চাটুয্যের মুখে চুন-কালী দিতে না পারি, তা হলে আমি শীতল ঠাকুরই নই। আমি পাজী, আমি গেঁজেল; আর উনি ভদ্র লোক!" এই বলিয়া শীতল ঠাকুর সে স্থান ত্যাগ করিল। কাহারও সাধ্য হইল না যে একটি কথা বলে।

[১৩]

সাত-আনির বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিয়া শীতল হাসি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না। সে একেবারে হাসিয়া আকুল হইল। হো-হো-হো, আরে হা-হা-হা!

নয়-আনির গোপাল সর্দ্দার পথ দিয়া যাইতেছিল; সে ঠাকুরের হাসি শুনিয়া আর তার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বলিল "কি গো ঠাকুর! আজ বুঝি মাত্রাটা খুব চড়িয়েছ। একেবারে হেসে যে পাগল হয়ে গেলে।"

শীতল ঠাকুর তাড়াতাড়ি যাইয়া গোপালের হাত ধরিয়া বলিল "ওরে গোপাল! হাঃ-হাঃ হাঃ। হো-হো হো।"

গোপাল বলিল, "তুমি সত্যিই পাগল হলে না কি! কথা নেই, বার্ত্তা নেই, শুধু হাঃ হাঃ আর হোঃ হোঃ! বলি ব্যাপারটা কি?"

"ওরে বেটা গোপলা! আরে হাঃ হাঃ হাঃ!"

"যাও ঠাকুর, তোমার সঙ্গে মাতলামী করবার সময় নেই; আমি পুরুত-ঠাকুরকে ডাকতে যাচ্ছি। সর!"

"আরে বেটা, ফিরে চল ফিরে চল! পুরুতঠাকুর সাত-আনিতে হাঃ হাঃ হাঃ! ওরে তার বদলে আমাকে নিয়ে চল, বুঝলি গোপাল, পুরুতের কাজ আমার দিয়েই হবে, হাঃ-হাঃ হাঃ।"

"তুমি বল কি ঠাকুর! যেতে হয় তুমিই যাও। আমি পুরুত ঠাকুরের বাড়ী খবর না দিয়ে যাচ্চিনে!"

"ওরে বেটা গয়লা, শোন্! স্বধু এ তেল-কুচকুচে সাড়ে চারহাত পাকা বাঁশের লাঠি, আর বাবড়ী চুল, আর ঐ কোমরে গোট থাকলেই সর্দ্দার হয় না রে বেটা! সর্দ্দার ত এই শীতল ঠাকুর!" এই বলিয়া সে তিন লাফ দিয়া নিজের বুকে দুই চপেটাঘাত করিল। তাহার পর বলিল "ওরে ব্যাটা, সে-দিন একটা বাজে মামলা জিতে একেবারে বাবড়ী নেড়ে নাচ্‌তে-নাচ্‌তে এসেছিলি! ভারি ত একটা মামলা! তাতে সাত আনির আর কি হয়েছে। আজ যে ব্যাটা একেবারে বাজী মাৎ! হাঃ-হাঃ হাঃ!"

গোপাল, বলিল, "কি বাজী মাৎ দাদাঠাকুর!"

"হ্যাঁ, এখন পথে এস বাবা, তোদের গিন্নী-মা এই বিশ বছরে যা করতে পারেন নি, বুঝলি গোপাল! এই শর্ম্মা হাঃ-হাঃ-হাঃ" বলিয়া শীতল তাল ঠুকিল।

গোপাল বলিল "তাই কি?"

"কি? তোর বাবার মাথা! তোদের সাত-আনিকে একেবারে এককড়া কাণা-কড়ি করে দিয়ে এই এলাম। সে ভারি মজা! হাঃ-হাঃ?হাঃ।"

গোপাল বলিল "যাক্ গে, তোমার ও ঝোঁকের কথা আর দাঁড়িয়ে শুন্‌তে পারছিনে। আমি চল্লাম!" এই বলিয়া গোপাল সর্দ্দার পুরোহিত মহাশয়ের বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল।

শীতল বলিল "যা বেটা গয়লা! ঐ যে কি বলে না—অরসিকের

কাছে! থাক্, আর পথের মধ্যে মুক্তো ছড়িয়ে কাজ নেই। যাই একবার সিধু বাবুর কাছে, প্রাণ খুলে একবার হেসে নিই গে! জিতা রও বাবা চতুরং! তোমারই নেশাতে আজ একেবারে সাত-আনি এই এতটুকু—একেবারে ঘসা-আধ্‌লা!" এই বলিয়া অনুচ্চস্বরে কি বলিতে বলিতে শীতল ঠাকুর নয়-আনির বাড়ীতে যাইয়া দেখিল, বাহিরে বাবুর খাস ভৃত্য চৈতন দাঁড়াইয়া আছে।

ঠাকুর তাহার কাছে যাইয়া বলিল "ওহে বাপু চৈতন্যচন্দ্র না চৈতন দাস, একবার বাবুকে খবর দেও যে, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভবদীয় দর্শনপ্রার্থী; বুঝলে বাবা!"

চৈতন বলিল "কি ঠাকুর, আজ যে দেখ্‌ছি ভারি ফূর্ত্তি। ক-ছিলিম উড়িয়েছ?"

"আরে রেখে দাও না ভাই তামাসা! বাবুকে খবর দেও! তখন দাঁড়িয়ে শুনো—ক-ছিলিমে সাত-আনি দখল হয়েছে।" এই বলিয়া সে বারান্দায় উঠিয়া একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল।

চৈতন বলিল "সত্যিই বাবুকে খবর দিতে হবে?"

"সত্যি না কি মিথ্যা। তোর সঙ্গে তামাসার সম্বন্ধ আছে না কি? যা, যা, যে বক্‌শীস্ মিলবে—তার আধা-বখ্‌রা! হাঃ—হাঃ—হাঃ!"

চৈতন আর কথা না বলিয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। শীতল গুণ-গুণ করিয়া গান ধরিল—

"তারিতে হবে মা তারা! হয়েছি শরণাগত।
অনায়াসে তরে গেল কত পাপী আমার মত।—আহা বেশ!"

চৈতনের ফিরিতে বিলম্ব হইল না ; সে আসিয়া বলিল "একটু বোসো ঠাকুর, বাবু এখনই আস্‌বেন !"

"আরে ভাই, এখনি এলেও বস্‌ব, তখনি এলেও বস্‌ব। আমার কি যাওয়ার যো আছে ? এত কথা পেটে করে বাড়ী গেলে যে বদ্‌-হজমেই মরব ; আর একেলা-একেলা হাস্‌বই বা কত, বুঝেছ চৈতন ?"

চৈতন বলিল "বুঝলাম আর কৈ ঠাকুর !"

শীতল বলিল "না বুঝলে আর কি করি বল ? আমি ত বুদ্ধি দিতে পারিনে। বুদ্ধি চাইতে গেলে একটু-আদটুকু নেশা করতে হয়। হাঃ—হাঃ—হাঃ।"

"আমরা গরিব মানুষ, পেটই চলে না, তার আবার নেশা !"

"অমন নেমকহারামী কথা বলিস্‌নে চৈতন, বলিস্‌নে। তোর আবার পেট চলে না। তুই হচ্ছিস্ খাস-খানসামা। দুই হাতে লুঠছিস্ ! তোর আবার পয়সার অভাব। একটু একটু গাঁজা ধর। মদ-টদ বলিনে, ও জানিস্ আমিরী নেশা। একটা পয়সার ওয়াস্তা, ব্যস্, একেবারে রাজা-বাদশাই বা কে, আর তুই বা কে ! নইলে আমি এই শীতল ভট্‌চায, আমি কি না, আরে হাঃ হাঃ হাঃ।"

"তুমি কি এমন কাজ করেছ যে, হেসেই অস্থির !"

"কাজ—কাজ নয় রে, কর্ম্ম। বুঝেছিস্, এর নাম হলে কর্ম্ম। আসুন না তোর বাবু, তখন শুন্‌তেই পাবি—কাজ, না কর্ম্ম ; যাকে বলে 'ডোন্ কেয়ার'—তাই করে এসেছি।"

শীতলকে আর বেশী বাগাড়ম্বর করিতে হইল না ; বিধু বাবু

বাহিরের বারান্দায় আসিলেন। শীতল উঠিয়া দাঁড়াইতেই সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "ও কি শীতল ঠাকুর, তুমি উঠ্‌লে যে, বোস বোস।"

শীতল বলিল "আরে বাপ রে, আপনি হলেন নয়-আনির জমিদার, আর আমি একেবারে এককড়ি। আমি কি আপনার সুমুখে বস্‌তে পারি। নেশাটা-আসটাই করি বড় বাবু, কিন্তু মানীর মান রক্ষা করতে ভুলিনে। তবে আজকে—হাঃ হাঃ হাঃ।"

"আজকে কি হয়েছে! তুমি যে হেসেই গেলে।"

"আর বড় বাবু, আজ যে কাণ্ডটা করে এসেছি—তা মনে হলে যে হাসি চাপতেই পারিনে। সে ভারি মজার কথা—হাঃ হাঃ হাঃ।"

"ঠাকুর, তা হলে তুমি আগে খানিকটা হেসে নেও, তারপর কথা বোলো। রাত্রি কিন্তু নটা, আহারাদি হয়েছে ত? এত রাত্রে এমন কি মজার কথা নিয়ে এসেছ।"

শীতল বলিল "আহারের কথা বল্‌ছেন? ও-সব হাঙ্গামা রাত্তিরে আর করিনে। এই বাড়ী গিয়ে এক ছিলিম তামাক খেয়ে আর কি, একেবারে শয়নে পদ্মনাভ।"

"আচ্ছা সে কথা পরে হবে; এখন বল ত, কি কথার জন্য তুমি এসেছ?"

শীতল বলিল "সে অনেক ব্যাপার! দাঁড়িয়ে শোনবার কথা নয়; আপনি বসুন, আমি ধীরে-ধীরে বল্‌ছি।"

সিদ্ধেশ্বর একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া বলিলেন "তুমিও এখন বোসো। বোসো, তারপর তোমার কথা বল।"

শীতল বেঞ্চের উপর বসিয়া সবে কথা আরম্ভ করিতে যাইবে, এমন সময় গোপাল সর্দ্দার লণ্ঠন দেখাইতে-দেখাইতে পুরোহিত শ্রীযুক্ত রঘুদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আনিয়া উপস্থিত করিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় শীতলকে দেখিয়াই বলিলেন "আচ্ছা বাহাদুর তুমি শীতল! হাঁ, একটা মানুষের মত মানুষ! তুমি আজ যা করেছ, এ দেবীপুরে কেন, এ তল্লাটে এমন কেউ করতে পারে না। আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। মনোহর বাবুর মুখের উপর এমন কথা বল্‌তে যে তোমার কেমন করে সাহস হোলো, তাই আমি ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছি!"

শীতল ঠাকুর বলিল "উচিত কথা বল্‌তে এই শীতল ভট্টাচার্য্য কাউকে ডরায় না। কেমন, উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে ত? একঘরে করতে চায়—অমনি একঘরে বল্‌লেই হোলো।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "বাঃ, এ ত মন্দ ব্যাপার হোলো না। আমি যে এর বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছিনে।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহার দিকে একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "কেন, শীতল কিছু বলে নাই।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "বল্‌বে কি, হেসেই অস্থির!"

শীতল বলিল "না, নিজের প্রশংসা আর নিজে নাই করলাম। ভট্‌চা'য মশাই, আপনিই বলুন।"

রঘুদেব ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন একে-একে সমস্ত কথা বলিলেন, একটা সামান্য কথাও বাদ দিলেন না। অবশেষে

বলিলেন "মনোহর বাবু বোধ হয় আর কিছু করতে সাহস পাবেন না। হয় ত কা'ল সকালে শীতলকে ডেকে ঠাণ্ডা করে দেবেন।"

শীতল বলিল "কি, আমাকে ঘুস্ দেবে? তা হবার যো নেই। মনোহর চাটুয্যে যদি বড় বাবুর বিরুদ্ধে কিছু একটু করে, তা হ'লে আমি একেবারে দেশে-বিদেশে ঢোল পিটিয়ে দেব, খবরের কাগজে পর্য্যন্ত সব কথা তুলে দেব। আর কিছু করতে হবে না—সাত-আনি একেবারে আধ-আনি হয়ে গিয়েছে বড় বাবু!"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "কাকা-বাবুর পক্ষে আজকার দিনটা দেখ্‌ছি বড়ই খারাপ গেল। এই বিকেল বেলায় আমার সঙ্গে কথান্তর হোলো; তারপর এই এখন শীতল ঠাকুরের সঙ্গে! সে কথা থাকুক, আপনাকে কষ্ট দিলাম একটা কথার জন্য। আপনি বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, শাস্ত্রজ্ঞ; আপনি সর্ব্বাংশেই আমার হিত চিন্তা করেন। আপনিই বলুন ত, আমরা কি অন্যায় কাজ করেছি? এই কথাটা জানবার জন্যই মা আপনাকে ডেকে আনতে বলেছিলেন। এর থেকে আপনি এমন বুঝবেন না যে, আমরা সঙ্কল্প ত্যাগ করব। তবুও আপনাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য মনে করেই বল্‌ছি।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "দেখ সিদ্ধেশ্বর, তোমাদের এ কার্য্যকে আমি কিছুতেই অন্যায় বল্‌তে পারব না; তোমরা যা করেছ,তাহাই করা প্রকৃত মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তবে কথা কি জান, ঐ প্রকার অত্যাচারগ্রস্তা স্ত্রীলোককে এতদিন কেহ সাহস করিয়া সমাজে স্থান দিতে পারে নাই। কিন্তু সনাতন

হিন্দুধর্ম্ম এখন হৃদয়হীন ধর্ম্ম নয় যে, নিরপরাধা বিধবার উপর এমন অবিচার করতে পারে। শাস্ত্রের বিধান মানতে হবে বটে, কিন্তু কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার সময়, জান ত বচনই আছে—কেবলম্ শাস্ত্রমাশ্রিত্য ইত্যাদি। তোমাকে ত আর সে কথা বিশেষ করে বলতে হবে না। তোমরা যা করেছ, তা সমাজে প্রচলিত নেই ; কিন্তু তাই বলে যে অকর্ত্তব্য, এ কথা আমি বলতে পারব না।”

সিদ্ধেশ্বর পুনরায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি লইয়া বলিলেন “বেশ, তা হোলেই হোলো। আপনি একবার অন্দরে যান, মা আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। চৈতন, ঠাকুর মশাইকে একটা আলো দেখিয়ে মার কাছে নিয়ে যা ; আর তাঁকে ব’লে আয় যে শীতল ঠাকুর এখানে আহার করবে।”

শীতল বলিল “বড় বাবু, এ শাস্তি আমাকে বিনা দোষে দিচ্ছেন কেন? এই রাত্রি নটার সময় আহার! তাও আবার যে-সে বাড়ীতে নয়, নয়-আনির বড় গিন্নীর কাছে। না, বড় বাবু, এ অত্যাচার সইবে না।”

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন “শীতল ঠাকুর, সে জন্য ভয় নেই। বাড়ী যাবার সময় কিঞ্চিৎ বড়-তামাকও তোমার চাদরে বেঁধে দেবার ব্যবস্থা করে দেব। তা হলে ত আপত্তি নেই।”

শীতল বলিল “এক-হিসেবে আপত্তি নেই ; কিন্তু লজ্জা ব’লে একটা জিনিস ত আছে বড় বাবু! নেশাটা যে ভাল নয়, তা বেশ বুঝি ; কিন্তু ঐ যে বলে ‘জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ’—আমারও

তাই হয়েছে,—সেই দশ বছর বয়স থেকে ধরেছি, এখন আর ছাড়তে পারি নে। তবুও আপনার মুখ থেকে কথাটা শুনে কেমন লজ্জা করছে।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "আচ্ছা, শীতল ঠাকুর, তুমি কি কোন দিন এই নেশা ত্যাগ করবার জন্য চেষ্টা করেছ?"

শীতল বলিল "ঐ যে বল্‌লাম, নেশাটা যে মন্দ, তা ত বুঝি; কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে পারিনে; চেষ্টা করেছি বই কি?"

"না, তুমি হয় ত তেমন চেষ্টা কর নাই। তুমি সৎ-ব্রাহ্মণের ছেলে, লেখাপড়াও জান; সংস্কৃতও পড়েছিলে; তুমি কি চেষ্টা করলে এই সামান্য নেশাটা ছাড়তে পার না। তারপর, আমি জানি, তোমার আর কোন বদ্‌খেয়াল নেই—সুধু ঐ নেশাটুকু।"

শীতল বলিল "তা বড় বাবু, অহঙ্কার করে বল্‌তে পারি, এই ত বয়সও প্রায় চল্লিশ হ'তে চল্‌ল; এর মধ্যে আমি কখন স্ত্রীলোকের সংসর্গ করি নেই; কারও দিকে কখন কু-নজরে চাই নেই। সে কথা আমাকে কেউ বল্‌তে পারবে না।"

"তবেই ত দেখ, তোমার এত গুণ, সব মাটী করেছে ঐ নেশায়! আমার কথা শোন, গাঁজা-ভাঙটা ছেড়ে দেও। চেষ্টার অসাধ্য কি কাজ আছে?"

শীতল বলিল "আচ্ছা, আপনার কথায় আর একবার চেষ্টা করব। অনেক দিনের অভ্যাস।"

"দেখ, কোন একটা বদ্ অভ্যাস ধীরে ধীরে চেষ্টা করে ছাড়া যায় না; একেবারে একদিনে ছেড়ে দিতে হয়। মন খুব দৃঢ়

করতে পারলেই হয়। তুমি তা নিশ্চয়ই পার। আমি বলছি, তুমি তা নিশ্চয়ই পার।"

শীতল কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাড়ীর মধ্য হইতে একটী চাকর আসিয়া সংবাদ দিল যে, আহার প্রস্তুত। তখন সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "আজ ও-কথা থাক, আর একদিন হবে। তোমাকে আমি নেশা ছাড়াব। এখন চল, দেখি ভগবান তোমার জন্য এ বেলা কি মাপিয়েছেন।"

[১৪]

হরিহরের পত্র

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

দাদা, সেদিন মণিপুরের মহাভারত শোনবার জন্য বাবার কাছে নিয়ে গিয়ে তুমি যা শুনিয়েছ, তা যে মহাভারত নয়, সে কথা মূর্খ আমিও হলফ করে বলতে পারি; বরঞ্চ তার সঙ্গে রামায়ণের কাণ্ড-বিশেষের অল্প-বিস্তর তুলনা হতে পারে। আরে বাবা রে! কোথায় মৃদু সমীরণ আশা করে গিয়েছিলাম, না— একেবারে টর্পেডো। তবুও যা হোক মহাপ্রলয় হয় নাই।

সত্য কথা বলিতে কি দাদা, তোমার মত স্থির গম্ভীর প্রশান্ত মহাসাগরে একেবারে 'বে-অব বিস্কের' উত্তাল-তরঙ্গ দেখে আমি 'ত প্রথমে অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম; তারপর যখন তোমার তরঙ্গ-গর্জ্জন হতে লাগল, তখন একবার অমনি একটু সময়ের জন্য তোমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলাম, সেটা ঐ উপরের একটু তরঙ্গ, তার নীচে ধীর স্থির দাদা আমার স্নেহ-মমতায় পূর্ণ!

তোমরা খুড়া-ভাইপোয়ে করবে ঝগড়া-বিবাদ, আর মাঝে থেকে বিপদ এই ক্ষুদ্র জীবটীর। আমার উপর আদেশ প্রচারিত

হয়েছে যে, আমি তোমাদের বাড়ী যেতে পারব না। সে আদেশ আমাকে মেনে চল্‌তেই হবে; কারণ তুমিই ত ছেলেবেলায় মুখস্থ করিয়ে দিয়েছ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্ব দেবতাঃ। সুতরাং, এখন আমি নির্ব্বাসিত!

দেখ, সেদিন তোমার কথা শুনে আমি বেশ বুঝতে পেরে-ছিলাম যে, আমি তোমার পক্ষে কার্য্য করার অন্তরায়। তুমি আমার মুখ চেয়ে যে সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট নীরবে সহ্য করবে, এই কথা বলে গিয়েছ। তোমার মত দাদার উপযুক্ত কথাই হয়ে-ছিল বটে, কিন্তু নয়-আনির জমিদারের মত কথা হয় নাই। শুনেছি, সেকালে নাকি কথায়-কথায় দুই বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নীরা হুকুম দিতেন 'দশ হাজার টাকা বকশিস্! লে আও অমুক বাবুর মাথা!' এখনও সেই বনিয়াদী নিয়মটা চালাও না; ঐ রকম হুকুমই দেবীপুরের বাবুদের মুখে শোভা পায়; তা নয়, ক্ষমা করব, নীরবে সহ্য করব, এ সব তৃণাদপি-সুনীচেন বাক্য তোমাদের মুখে ভাল শোনায় না। তোমরা বলবে চণ্ডীর মত 'তিষ্ঠ তিষ্ঠ ক্ষণং মূঢ়ং' বা ঐ রকম কিছু। দেখ, এ সব সরিক্কান ব্যাপারে তুমি ভুলে যেও যে, হরিহর নামে তোমার একটী ভাই আছে। সত্যি দাদা, সেদিন তোমার রাগ ও ক্ষমা দুইটাতেই আমি অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার জন্য যদি সব নীরবেই সহ্য করবে বলে জান, তবে আবার সেদিন কেন স-রব হ'লে?

তোমাকে একটা ভারি মজার সংবাদ দিচ্ছি। এটা আমার কিন্তু শোনা কথা, আমি নিজে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম না।

তোমাকে একঘরে করবার জন্য সেদিন আমাদের বাড়ীতে একটা বিরাট সভার অধিবেশন হয়েছিল। 'বিরাট' কথাটা শুনে চমকে যেও না দাদা! ওটা খবরের কাগজের প্রিয় বিশেষণ; ১৫ জনের মিলিত সভা হলেও খবরের কাগজে বেরিয়ে যায় একটা বিরাট মহতী সভা। এটাও সেই হিসাবে বিরাট; অর্থাৎ কি না এই পাড়ার পাঁচ সাত জন সভায় সমবেত হয়েছিলেন; তার মধ্যে না কি বিনা আহ্বানে এক মহারথীর আবির্ভাব হয়েছিল। সে আর কেহ নহে—শীতল ঠাকুর! দেখ, আমি তোমাকে বল্‌ছি, এই গাঁজা-খাওটা বাদ দিলে শীতল ঠাকুর একটা মানুষের মত মানুষ! গাঁজা ছাড়া তার আর কোন দোষ নেই। সেইদিনের সে মজলিস্ হয়েছিল, সেটা তোমাকে একঘরে করবার জন্য। সে সঙ্কল্প একেবারে উল্‌টে দিয়েছে ঐ শীতল ঠাকুর! বাহাদুর লোক বটে! সে না কি গ্রামের অনেকের, এমন কি যারা সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরও, দুই একজনের মহাপাপের কথা উল্লেখ করে প্রথমে তাঁদের একঘরে করতে বলেন; তার পর তোমার অপরাধের বিচার! আরও শুনলাম, সে না কি বাবাকেও অতি ভীষণ ভাবে আক্রমণ করেছিল। কথাটা শুনে আমার দুঃখ যে না হয়েছিল, এমন কথা দাদা, তোমাকে বল্‌তে পারব না; কিন্তু, এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে নিরপেক্ষ ভাবে বল্‌তে গেলে, শীতল ঠাকুর কিছুই মিথ্যা বা অন্যায় বলে নাই। তোমার শিক্ষা এই যে, কাউকে অপ্রিয় সত্য না বলাই ভাল। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে ও-উপদেশে মেনে চল্‌লে ফল ভাল হয় না। এই ত সেদিন যদি

শীতল ঠাকুর অপ্রিয় সত্য না বলে ফেল্‌ত, তা হলে তুমি ত এক-ঘরে হয়েছিল। তা হলে কি হত বল ত! তোমার বাড়ী কেউ খেয়ে যেত না, তোমার বাড়ীর পূজা-পাঠ সব বন্ধ হয়ে যেত; যে টাকাগুলো তুমি আমাদের মত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ভোজনে ব্যয় কর, তা তোমার বেঁচে যেত। কি দুর্দ্দৈব থেকে শীতল ঠাকুর তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাকে একদিন খুব পেট-ভরে খাইয়ে দেওয়া তোমার উচিত; আর তার সঙ্গে উপযুক্ত দক্ষিণা কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা! গঞ্জিকার নাম শুনে লাফিয়ে উঠো না। ঐ গঞ্জিকাই তোমাকে এবার একঘরের দায় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সাদা-চোখে কেউ বাবাকে অমন কথা শোনাতে সাহস পেত না; শীতল ঠাকুরের ঐ গঞ্জিকা সহায় ছিল বলেই সে এমন কর্ম্ম পেরেছে।

এতক্ষণ আসল কথা বল্‌লাম; এখন একটু বাজে কথা বলি। গায়ে গায়ে বাস, অথচ চিঠি লিখে কথা বল্‌তে হয়; এর চাইতে আর দুর্ভাগ্য কি আছে বল ত। ঐ যে একটা গান শুনেছিলাম 'সে আর লালন এক স্থানে রয়, তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে!' আমাদেরও তাই হয়েছে। এই নয়-আনি আর সাত-আনি মিলে গিয়ে ষোল-আনা কবে হবে, আমি তাই ভাবছি;—এই মণ্টেগু আর ক্যাপুলেটের বিবাদ কবে মিট্‌বে দাদা।

শোন, যে কথা নিয়ে এই বর্ত্তমান সামাজিক গোল উঠবার মত হয়েছিল, হয় ত বা এখানে না উঠ্‌লেও আর কোথাও উঠতে পারে, সে সম্বন্ধে তুমি আমার মত জানবার জন্য উৎসুক না হতে

পার, কিন্তু আমি তোমাকে আমার মত না জানিয়ে পারছি নে। তুমি হয় ত ব'লে বস্‌বে 'তুই আবার একটা মানুষ, তোর আবার মত। সে-দিনের ছেলে আবার মুরুব্বীগিরি করতে আসে।' তুমি পাড়াগাঁয়ে থাক, সহর-বাজারের খবর ত জান না, তাই হয় ত অমন একটা মন্তব্য পাশ করতে পার। কিন্তু, আমরা নিতান্ত ফেল্‌না নই; যাকে তোমরা negligible quantity বল, আমরা তা নই। আমাদের দেশের যাঁরা নেতা, তাঁরা হরদম্ বক্তৃতায়, খবরের কাগজে, প্রবন্ধে বল্‌ছেন যে, আমরাই দেশের আশা-ভরসা, আমরাই সব। আমরা, এই কলেজের ছেলেরা, ভোট না দিলে তাঁদের 'মেজরিটি'ই হয় না। সুতরাং এই সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে তুমি আমার মত নিতে বাধ্য; বিশেষতঃ, দুই দিন বা দশ-বৎসর পরে আমিই এই সাত-আনির বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে পরম-ভট্টারক শ্রীল শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুক্ত হরিহর চট্টোপাধ্যায় জমিদার মহাশয় প্রবল-প্রতাপেষু হয়ে পড়ব। তামাসা থাক্, বাবা যাই বলুন না, সমাজের সেকলে ঘুনে-ধরা বিধানে যাই থাকুক না কেন, আমি তোমার এই কার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি (ঘন করতালি)। আমি এ সম্বন্ধে তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি, তা তুমি মন খুলে আমাকে লিখ্‌বে; আমি তাই করব। আমি একেবারে তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করছি—যাকে বলে unconditional surrender—ইংরেজী না বল্‌লে ত তোমরা বোঝ না, আর ইংরেজী বুকুনি না দিলে আমাদেরও মনে হয়, কথাটা বুঝি স্পষ্ট হোলো না। এমনই আমাদের শিক্ষা! সে কথা

যাক্, আমি স্পষ্ট কথায় তোমাকে জানাচ্ছি,তুমি কোন ভয় কোরো না। তোমার উদ্দেশ্য সাধু। তোমাকে যতই ভয় দেখাক্ না কেন, আমরা এই বাঙ্গলা দেশের যুবকদল, এই ইয়ং বেঙ্গল রেজিমেণ্ট তোমার দিকে আছি। এই কথাটা তোমাকে জানাবার জন্মই এই চিঠিখানা লিখ্‌লাম। তোমাকে আর বেশী বিরক্ত করব না।

আমি দুই-একদিনের মধ্যেই কলিকাতায় পলায়ন করছি। বাড়ীতে আর থাক্‌তে পারি না। কেন, তা তুমি ভালই জান। পত্রের উত্তর দিও। বাবার আদেশ ; যাবার সময় তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে যেতে পারব না। তুমি না হয় একটু ধুলো (যদি পায়ে থাকে) আমাকে চিঠির মধ্যে পাঠিয়ে দিও ; আমি তাই মাথায় নিয়ে পবিত্র হব। ইতি

তোমার স্নেহের ভাই—হরিহর।"

সিদ্ধেশ্বর বাবুর উত্তর

ভাই হরিহর,

তোমার পত্র পাইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বে দেশের শীর্ষস্থানীয় হও।

তুমি সত্যই বলিয়াছ, পাশাপাশি বাড়ী, অথচ পত্র লিখিয়া কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান করিতে হয়, ইহার অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে ? ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সত্বর যেন এ লজ্জাকর বাধা দূর হইয়া যায়। কিন্তু, আপাততঃ যখন কাকা-বাবু এই দূরত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখন তুমি তাঁহার পুত্র,

এ বাধা অতিক্রম করিয়া পিতৃদ্রোহের পরিচয় দিও না। এ উপদেশ দেওয়া আমার পক্ষে শোভন হইতেছে না, কারণ আমি পিতৃব্য-দ্রোহী। কিন্তু, তুমি জান, আমি নানা কারণে বিশেষ বিপন্ন হইয়াই কাকা-বাবুর মতের বিরুদ্ধাচরণে বাধ্য হইয়াছি। সত্য ও ন্যায়ের অনুরোধেই সেদিন কাকাবাবুর প্রতি রূঢ় আচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, এবং এ কথা বলিলে সত্যের আপলাপ করা হয় যে, সাময়িক উত্তেজনাও আমাকে কথঞ্চিৎ অধীর করিয়াছিল। আমার সেদিনের আচরণে আমি নিজেই বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছি; নীরবে সমস্ত অপমান সহ্য করিয়া আসিলেই ভাল করিতাম। বলিতে কি, আমি আত্মগর্ব্ব ও মর্য্যাদাকে সেদিন একটু উচ্চ আসনে বসাইয়াছিলাম। অহংকে এতটা প্রশ্রয় দেওয়া ভাল হয় নাই। আমার অনুরোধ, তুমি সেদিনের আমার ব্যবহার ভুলিয়া যাইও; এবং তোমার দাদার এই সাময়িক উত্তেজনা-জনিত ধৃষ্টতাকে উপেক্ষা করিও। আরও একটা কথা মনে রাখিও, আমি সামান্য মানুষ; মানুষের যে সমস্ত দুর্ব্বলতা, তাহা আমার মধ্যে পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান। আমাকে তুমি কোন দিন তোমার আদর্শ-স্থানীয় করিও না; তাহা হইলে আমার মত তুমিও সহস্র অপরাধে অপরাধী হইবে।

এত কথা তোমাকে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি কখন আমার পন্থা অনুসরণ করিও না। আমি আমার পিতৃব্যকে অপমানসূচক কথা বলিয়াছি, অতএব তুমিও তাহা করিতে পার, এ কথা মনেও স্থান দিও না। মনে রাখিও, তিনি তোমার

পিতা, তোমার জনক ; তিনি এখন তোমরা নিকট দেবতা ভাবে পূজিত হইবেন। মানুষের দোষক্রটী থাকে, তাঁহারও আছে ; কিন্তু তুমি পুত্র হইয়া পিতার আচরণের বিচার করিবার অধিকারী নও। ঘরে-ঘরে বাদশাহ আওরংজীবের অধিষ্ঠান কিছুতেই মঙ্গলজনক নহে। তুমি কখনও তোমার পিতার অবাধ্য হইও না। কিন্তু, তাই বলিয়া তাঁহার আদেশে যে তুমি অন্যায় ও অধর্ম্ম আচরণ করিবে, তাহাও আমি বলিতেছি না। সে স্থলে তুমি দূরে সরিয়া যাইও, স্থানান্তরে চলিয়া যাইও, কিন্তু সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধাভরে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিও না। এই মনে কর, তিনি যদি আমার সহিত শত্রুতাচরণ করেন, আমাকে নানা ভাবে বিপন্ন করিবার আয়োজন করেন, সে স্থলে তুমি বুদ্ধিমান পুত্র, তোমার কর্ত্তব্য অতি ধীর ভাবে তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করা। তাহাতে যদি অকৃতকার্য্য হও, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টিবহির্ভূত স্থানে চলিয়া যাইবে ; তাঁহার কার্য্যের কোন সংস্রবে থাকিবে না। ইহাই তোমার কর্ত্তব্য এবং ইহাই আমার উপদেশ এবং আদেশ।

শীতল ঠাকুরের কথা বলিয়াছ। তাহাকে আমি বিশেষ ভাবে জানি। ঐ যাহা বলিয়াছ, গাঁজার নেশা ব্যতীত তাহার আর কোন দোষ নাই। তুমি যে ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছ, তাহা আমি শীতল ঠাকুর ও পুরোহিত মহাশয়ের নিকট সেই রাত্রিতেই শুনিয়াছিলাম। পাগলা ঠাকুর ত হাসিয়াই আকুল! কি যেন একটা কীর্ত্তিই সে করিয়া আসিয়াছে। সে তাহার হাস্যের অতিশয্যে কিছুই বলিতে পারিল না; পুরোহিত মহাশয়ই আদ্যোপান্ত ব্যাপার বলিয়াছিলেন।

যাক্, এ সকল অপ্রীতিকর ব্যাপারের আলোচনা বন্ধ করই ভাই।

যে ঘটনা লইয়া এই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তুমি কি সাহায্য করিতে পার, জানিতে চাহিয়াছ। তুমি আমার একটী সাহায্য করিতে পার, তাহা এই যে, তুমি এ ব্যাপারে আপাততঃ সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিও। তাহা হইলেই আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করা হইবে। তোমার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ যুবকের যে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকিবেই, এ কথা না লিখিলেও পারিতে; তাহা আমি জানি। তবে এ সকল বিষয়ে আত্মোৎসর্গ করিবার সময় এখনও তোমার হয় নাই; এখন তোমার চিন্তা, যত্ন ও চেষ্টা জ্ঞানানুশীলনে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত থাকে, ইহাই আমি দেখিতে চাই। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার যখন সময় ও প্রয়োজন হইবে, তখন আমিই তোমাকে ডাকিব, তুমি তখন তোমার দাদার বল বৃদ্ধি করিও।

পত্রখানি বড় সংক্ষিপ্ত হইল; তাহাতে কিছু মনে করিও না। তুমি শীঘ্রই কলিকাতা যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ভালই করিয়াছ। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পূর্ব্বে আসিয়া সময় নষ্ট করিও না। লেখাপড়া সম্বন্ধে কখনও অবহেলা করিও না। দেশের কাজ করিবার যথেষ্ট সময় পরে পাইবে।

তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। কলিকাতায় যাইয়া শরীর কেমন থাকে, তাহা লিখিও। আমিও মধ্যে মধ্যে এখানকার সংবাদ তোমাকে জানাইব। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ

[১৫]

মনোহর বাবু এখন কায়মনোবাক্যে মমিনপুরের মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। এই মহালটা লইয়া অনেক দিন হইতেই নয়-আনি সাত-আনিতে গোলযোগ চলিতেছিল; এতদিনের মধ্যে সাত-আনি এই মহলে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। জেলার জজ আদালতে মোকদ্দমা এতদিন মুলতবী ছিল। মধ্যে একবার বিচারের দিন পড়ে; কিন্তু মনোহর বাবু তখনও ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে পারেন নাই বলিয়া, আপোষ হইবার সম্ভাবনা আছে, এই অজুহাত দেখাইয়া সময় লইয়াছিলেন। এখন আর সে অজুহাত চলিল না। মোকদ্দমা চালাইবার জন্য উভয় পক্ষই ভাল ভাল উকীল নিযুক্ত করিলেন; উভয় পক্ষই অনেক দলিল দাখিল করিলেন। মনোহর বাবু এবার একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি এ আদালতে জিতিবেন; তাহার পর হাইকোর্টের সাধ্যও হইবে না যে, নিম্ন আদালতের রায় রদ করেন—এমন পাকা দলিল তিনি দাখিল করিয়াছেন।

মনোহর বাবুর পক্ষ হইতে যে দিন পাকা দলিল উপস্থাপিত হইল, সেদিন নয়-আনির প্রবীণ উকিল মহাশয় বড়ই বিপদে পড়িলেন। এই দলিলখানি নাকচ করিতে না পারিলে তিনি মামলা কিছুতেই জিতিতে পারিবেন না,—এখানি একেবারে

ব্রহ্মাস্ত্র। সিদ্ধেশ্বর বাবুর স্বর্গীয় পিতা এবং মনোহর বাবু, এই উভয়েরই সহি এই দলিলে আছে। এইখানি মিথ্যা প্রমাণ না করিতে পারিলে মামলা কিছুতেই টিকিবে না। নয়-আনির উকিল বাবু কেন, ম্যানেজার বাবু পর্য্যন্তও এই দলিলের অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না। দলিলখানি যখন আদালতে পড়া হইল, তখন নয়-আনির উকিল মহাশয় আত্মরক্ষার জন্য বলিলেন "ধর্ম্মাবতার, আমরা প্রমাণ করিব যে, এই দলিল জাল। ইহার কথা আমরা জানি না; আমাদের সেরেস্তায় ইহার কোন নিদর্শন নাই।" সাত-আনির উকিল বাবু তাঁহাদের পুরাতন দুই চারি খানি কাগজ উপস্থিত করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। নয়-আনির উকিল বাবু দলিলখানি একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে চাহিলেন। তিনি চোখের চস্‌মাখানি বেশ ভাল করিয়া মুছিয়া লইয়া দলিল-খানি চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল কাগজের ছাপার দিকে। যে ফুলস্কেপ কাগজে দলিল-খানি লেখা, সেই কাগজে কাগজ-প্রস্তুতের সাল মুদ্রিত ছিল; সাদা কাগজে সাদা ছাপ দেওয়া; সেদিকে বোধ হয় দলিল প্রস্তুত-কারীরও সতর্ক দৃষ্টি পতিত হয় নাই। উকিল বাবু দেখিলেন যে, কাগজ-প্রস্তুতের সালের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই দলিল লেখাপড়া হইয়াছে। অন্য কেহ হইলে হয় ত তখনই লাফাইয়া উঠিতেন; কিন্তু প্রবীণ বহুদর্শী উকিল বাবু অতি ধীর ভাবে আরও দুই এক মিনিট দলিলখানি পাঠ করিয়া বিচারকের হস্তে প্রদান করিয়া

গম্ভীর ভাবে বলিলেন "অপর পক্ষ তাহা হইলে এই দলিলখানির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছেন।" সাত-আনির উকিল বাবু অপর পক্ষের উকিলের গম্ভীর ও উদাস ভাব দেখিয়া আরও বল পাইলেন। তিনি বলিলেন "আপনি যখন এতক্ষণ ধরিয়া বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিলেন, তখন অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, এই দলিল কৃত্রিম নহে, এবং অন্য প্রমাণ বলবৎ না হইলেও এই দলিলখানির বলেই মোকদ্দমা আমার অনুকূলে ডিক্রী হইবে।"

নয়-আনির উকিল বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন "সে বিষয়ে আমারও অন্য মত নাই, কারণ ইহাতে নয়-আনির স্বর্গীয় জমিদার মহাশয়ের স্বাক্ষর রহিয়াছে এবং সাত-আনির জমিদার মহাশয়েরও স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই স্বাক্ষর সম্বন্ধে ত অপর পক্ষের কোন দ্বিধা নাই।"

সাত-আনির উকিল বাবু আদালতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ধর্ম্মাবতার, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, মনোহর বাবুর অন্যান্য আরও অনেক স্বাক্ষর এই নথিতে আছে। তাহার সহিত এই স্বাক্ষর মিলে কি না।"

বিচারক মহাশয় আর কয়েকটী স্বাক্ষরের সহিত মিলাইয়া বলিলেন "স্বাক্ষর সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবারই কারণ নেই।"

তখন নয়-আনির উকিল বাবু অতি ধীর ভাবে বলিলেন "এই দলিল সম্বন্ধে আমার অতি সামান্য একটু বক্তব্য আছে। যে কাগজে এই দলিলখানি লিখিত হইয়াছে, সেই কাগজ প্রস্তুতের সাল উক্ত কাগজে সাদা অক্ষরে ছাপা আছে। আদালত কাগজখানি

আলোর দিকে ধরিয়া দেখিলেই তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। তখন জানিতে পারিবেন যে, যখন এই কাগজখানি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই দলিল লেখাপড়া হইয়াছে। অপর পক্ষ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া সকল দিকই ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ একটী বিষয়ে দৃষ্টি করেন নাই।"

সমস্ত আদালত শুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বিচারক মহোদয় কাগজখানি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "হাঁ, কাগজখানি 'মিল' হইতে প্রস্তুত হইয়া বাহির হইবার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেই দলিলখানি লিখিত হইয়াছিল।" এই বলিয়া তিনি দলিলখানি সাত-আনির উকিল বাবুর দিকে অগ্রসর করিয়া বলিলেন "আপনি একবার স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।"

সাত-আনির উকিল বাবু আর হাত বাড়াইতে পারিলেন না। তখন জজ বাহাদুর বলিলেন "এমন পাকা হুসিয়ার জমিদার এমন কাঁচা কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন; ইহা নিতান্তই গ্রহ-বৈগুণ্য বলিতে হইবে। উপস্থিত মোকদ্দমার বিচার আপাততঃ মুলতবী রহিল। আমি সাত-আনির জমিদার মনোহর চট্টোপাধ্যায়কে দলিল জাল করার অপরাধে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিলাম।"

সে দিনের মত আদালতের কার্য্য শেষ হইল।

[১৬]

দেবীপুরের সাত-আনির জমিদার প্রবল-প্রতাপ, মহামহিম শ্রীযুক্ত মনোহর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আর জেলার ধর্ম্মাধিকরণে হাজির হইতে হইল না ; বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের ওয়ারেণ্ট অপেক্ষাও বড় ওয়ারণ্টে অকস্মাৎ তাঁহার উপর জারী হইল ; এ ওয়ারেণ্টে জামিনে খালাসেরও ব্যবস্থা নাই। বিশ্বনাথের আদালত হইতে দূত আসিয়া তাঁহার সম্মুখে হঠাৎ হাজির হইলেন ; তিনি জাল দলিল এবং তদপেক্ষাও গুরুতর ও লঘুতর অনেক অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য বিশ্বনাথের ধর্ম্মাধিকরণে হাজির হইবার জন্য একাকী চলিয়া গেলেন ; সঙ্গে উকীল-মোক্তার বা দলিল-দস্তাবেজ লইয়া যাইবারও সময় হইল না। সেখানকার বিচারে কি হইল, সে সংবাদ উপন্যাস-লেখকের জানিবার সৌভাগ্য এখনও হয় নাই।

জজ-আদালতের হুকুম যখন মনোহর বাবুর নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি বৈঠকখানার বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। জেলা-প্রত্যাগত কর্ম্মচারী এই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার নিকট বলিবামাত্র তিনি “সিধু রে—”বলিয়া চীৎকার করিয়াই চৈতন্যহারা হইলেন, হাতের হুঁকাটী পড়িয়া গেল ! চেয়ার হইতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেই চাকরেরা আসিয়া তাঁহাকে চেয়ার হইতে তুলিয়া ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া

দিল। মুখে-চোখে মাথায় জল দেওয়া হইতে লাগিল; পাখার বাতাস করা হইতে লাগিল; ডাক্তার ডাকিবার জন্য লোক ছুটিল। হরিহর তখন কলিকাতায়; একজন ভৃত্য দৌড়িয়া নয়-আনিতে সংবাদ দিতে গেল। সংবাদ পাইবামাত্র সিদ্ধেশ্বর দৌড়িয়া আসিলেন; একটু পরেই রমাসুন্দরী আসিলেন; ডাক্তারও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "সব শেষ হইয়া গিয়াছে; হার্ট ফেল করিয়াছে।" সিদ্ধেশ্বর তাঁহার কাকা-বাবুর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সাত-আনির জমিদার-লীলা এক মুহূর্ত্তের ভরও সহিল না।

সংবাদদাতা কর্ম্মচারী যখন বলিল যে, মমিনপুরের মোকদ্দমার কথা শুনিবামাত্রই ছোট কর্ত্তা কেবল চীৎকার করিয়া বলিলেন "সিধু রে—," আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, তখন সিদ্ধেশ্বর বাবুর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মৃত্যু-সময়ে হরিহরের নাম তাঁহার মুখে আসে নাই, ভগবানের নামও তিনি করেন নাই,—ডাকিয়াছেন সিদ্ধেশ্বরকে; তাঁহারই নাম করিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন! সিদ্ধেশ্বর এই কথা শুনিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িলেন; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "কাকা-বাবু, তোমার সিধুকে কি জন্য ডেকেছিলে; একবার বল;—একটী কথা বল! আমিই কাকা-বাবুকে মেরে ফেলেছি।"

সকলে তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিল। কিন্তু সিদ্ধেশ্বরের শোকের বেগ আর থামে না;—তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "ও মা, শুন্‌লে ত, কাকা-বাবু হয় ত আমাকে কি বল্‌তে চেয়েছিলেন,

আর বলা গেলো না। আর শুনতে পেলাম না। কাকা বাবু, যদি অভিসম্পাৎ করতে হয়, তাই একবার বল। আমি মাথা পেতে নিচ্ছি!"

মোকদ্দমার এমন কি সংবাদ, তাহা তখন পর্য্যন্তও কেহ শোনে নাই। রমাসুন্দরী একটু ধৈর্য্য ধারণ ক'রয়া বলিলেন "রাজেন্দ্র, মোকদ্দমার কি সংবাদ তুমি ছোট কর্ত্তাকে দিয়েছিলে?"

রাজেন্দ্র তখন অতি সংক্ষেপে মোকদ্দমার কথা নিবেদন করিল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল যে, কি ভয়ানক ভয়ে কাতর হইয়া মনোহর বাবুর হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল।

রমাসুন্দরী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাবা সিধু, তুমি ত ছোট কর্ত্তার বিরুদ্ধে কিছুই কর নাই। শুনলে ত অবস্থা! তবে আর কাতর হচ্চ কেন? তোমাকে অভিসম্পাৎ উনি করেন নাই। তোমার কি অনিষ্ট তিনি করতে গিয়েছিলেন, এই মনে করে কাতর হ'য়ে তোমাকে তিনি ডেকেছিলেন। তুমি অধীর হোয়ো না বাবা! এখনকার কাজ যা করবার, তাই কর।"

পুরোহিত মহাশয় এই সংবাদ পাইয়াই আসিয়াছিলেন; তিনি বলিলেন "হরিহর উপস্থিত নেই; এখন যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহা সিদ্ধেশ্বর বাবুকেই করতে হচ্চে। বড় বাবু, এখন কান্নার সময় নয়; সে সময় পরে অনেক পাবে। এখন তুমিই ছোট কর্ত্তার পুত্রের কার্য্য কর।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "জীবিতকালে ত আমি পুত্রের কার্য্য কিছুই করি নি; তাই বুঝি আমার এই শাস্তি!"

হরিহরকে অবিলম্বে বাড়ী আসিবার জন্য তার পাঠাইয়া দেওয়া হইল; দুর্ঘটনার কথা কিছুই তাহাকে জানান হইল না। তাহার পর শ্মশান যাত্রার আয়োজন করা হইতে লাগিল। রমাসুন্দরী কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন, বাড়ীতে চাকর-চাকরাণী যাহারা আছে, সকলকে এক-বস্ত্রে বাহির করিয়া দিয়া এখনই সমস্ত ঘরে তালা বন্ধ করা হউক। হরিহর বাড়ীতে না আসা পর্য্যন্ত কেহ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল; কাছারী-বাড়ী, দপ্তরখানা, খাজাঞ্চি-খানা, তোষাখানা, সমস্ত চাবি বন্ধ হইল। সমস্ত চাবি একটা লোহার সিন্ধুকে ডবল তালা দিয়া বন্ধ করিয়া, একটা চাবী রমা-সুন্দরী লইলেন, আর একটা চাবী প্রধান কর্ম্মচারীর জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল। অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্ত নয়-আনির বাড়ী হইতে সংগৃহীত হইতে লাগিল।

শনিবার বেলা তিনটার সময় মনোহর বাবুর মৃত্যু হয়, শ্মশান-যাত্রার আয়োজন করিতে করিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর অদূরবর্ত্তী নদীতীরে মৃত-দেহ লইয়া যাওয়া হইল; পুত্রের যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সিদ্ধেশ্বর অশ্রুপূর্ণ নয়নে সমস্তই করিলেন। গভীর রাত্রিতে সমস্ত শেষ করিয়া তাঁহারা বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এদিকে মৃত-দেহ বাড়ীর বাহির হইবার পরই রমাসুন্দরী নয়-আনির পাঁচজন এবং সাত-আনির পাঁচজন পাইক, এই দশজনকে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া সাত-আনির বাড়ী পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিয়া স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময়ই হরিহর বাড়ীতে আসিল। তাহাকে আর সাত-আনিতে যাইতে দেওয়া হইল না—সে বাড়ী যেমন বন্ধ ও প্রহরী-বেষ্টিত হইয়াছিল, তেমনই থাকিল।

সিদ্ধেশ্বর হরিহরকে সমস্ত কথাই বলিলেন; পিতৃশোকাকুল পুত্রকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা দিতে হয়, তাহাই দিলেন। রমা-সুন্দরীও তাহাকে অনেক উপদেশ দিলেন। সেই রাত্রিতেই স্থির হইল, পরদিন প্রাতঃকালে ঐ অবস্থাতেই হরিহরকে সঙ্গে করিয়া সিদ্ধেশ্বর জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। হরিহর আইন-অনুসারে এখনও নাবালক; অল্প কয়েকমাস পরেই সে সাবালক হইবে। পাছে নাবালকের সম্পত্তি, জিনিসপত্র, জমিদারীর কাগজপত্র কোন প্রকারে হস্তান্তরিত বা লুণ্ঠিত হয়, এই ভয়েই রমাসুন্দরী সাত-আনির বাড়ী সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হরিহরকে লইয়া সিদ্ধেশ্বর পরদিনই জেলায় চলিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের উকিল বাবুকে সঙ্গে লইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গেলেন। সিদ্ধেশ্বরের সহিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিশেষ পরিচয় ছিল; সাহেব তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, এবং জেলার মধ্যে একজন শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র জমিদার বলিয়া জানিতেন। কুঠীতে পৌঁছিয়া সংবাদ দিবা মাত্র মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাই-লেন; এবং সিদ্ধেশ্বরের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন "আপনার মাতা সাত-আনি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। তিনি বেশ কাজ করিয়াছেন।

হরিহর বাবু ত আর কয়েক মাস পরেই সাবালক হইবেন। এই অল্প দিনের জন্য আর এষ্টেট ওয়ার্ডের হাতে দিবার কোন প্রয়োজন মনে হইতেছে না। আমি এখনই কমিসনর সাহেবকে তার করিতেছি। যাহাতে আপনিই হরিহরের বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার পান, আমি সেই প্রস্তাবই করিতেছি। আপনারা আজই বাড়ী যাইবেন না; যাহাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কমিসনর সাহেবের আদেশ তারযোগে আসে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি। সিদ্ধেশ্বর বাবু, কমিসনর সাহেবও আপনাকে জানেন; আপনার উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, এ কথা একদিন কথা-প্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন। তারের জবাব আসিবামাত্র আমি উকিল বাবুকে সংবাদ পাঠাইয়া দিব।”

সিদ্ধেশ্বর বাবু বলিলেন “সংবাদ পাওয়া মাত্র আমরা মহাশয়ের নিকট আসিয়া সমস্ত বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়া যাইব।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হাসিয়া বলিলেন “সিদ্ধেশ্বর বাবু, কেমন করিয়া জমিদারী ম্যানেজ করিতে হয়, সে উপদেশ আমার নিকট অপেক্ষা আপনার মায়ের কাছেই ভাল পাইবেন।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যাহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাই মঞ্জুর হইল। কমিসনর সাহেব উপরের মঞ্জুরীর অপেক্ষা রাখিয়া আদেশ পাঠাইলেন যে, বাবু সিদ্ধেশ্বর চাটার্য্যি হরিহর বাবুর সাবালক না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষন করিবেন। সদর হইতে যেন একজন ডেপুটী অবিলম্বে দেবীপুরে যাইয়া সাক্ষী-দিগের সম্মুখে সাত-আনির বাড়ীর দ্বার খোলেন এবং সমস্ত বিষয়-

সম্পত্তি আসবাবপত্রের তালিকা করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবুকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে রসিদ গ্রহণ করেন। মৃত জমীদারের শ্রাদ্ধের ব্যয় সম্বন্ধে সিদ্ধেশ্বর বাবু যাহা সঙ্গত মনে করিবেন, তাহাই করিবেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া যথারীতি লিখিত-আদেশপত্র লইয়া এবং ডেপুটী বাবুর দেবীপুরে আগমনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দুই ভাই আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন।

পরদিনই ডেপুটী বাবু উপস্থিত হইলেন এবং কয়েকজন সাক্ষীর সম্মুখে সাত আনির বাড়ীর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি সিদ্ধেশ্বর বাবুকে বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিশেষ সমারোহেই মনোহর বাবুর শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ হইল; কোন প্রকার সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হইল না।

ইতঃপূর্ব্বেই সিদ্ধেশ্বর হরিহরের পড়াশুনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিয়া কমিশনর সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কমিশনর সাহেব উত্তর দিয়াছেন যে, যখন অল্প কয়েক মাস পরেই হরিহর বাবুকে জমিদারীর ভার গ্রহণ করিতে হইবে, তখন এখন হইতেই তাঁহার এ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্য; সুতরাং হরিহর বাবুর কলেজে পড়া এ সময় সঙ্গত হইবে না।

এই সংবাদ পাইয়া হরিহর বড়ই দুঃখিত হইল। সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "তুমি ইহাতে নিশ্চেষ্ট হইও না। একটা বৎসর অবশ্য নষ্ট হইবে। তুমি জমিদারী হাতে লইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া

তখন পুনরায় পড়া আরম্ভ করিও। আপাততঃ কমিসনর সাহেবের আদেশ অনুসারেই কাজ করা কর্ত্তব্য। বিষয়ের তত্ত্বাবধান সম্বন্ধে আমিও যেমন পণ্ডিত, তোমাকেও তেমনই শিক্ষা দিব। কিন্তু তোমাকে উদাসীন হইলে চলিবে না; মায়ের নিকট হইতে সমস্ত শিখিয়া লইতে আরম্ভ কর। আমি নামমাত্র অভিভাবক রহিলাম। যাহা কিছু কাজকর্ম্ম, সমস্তই মায়ের আদেশ অনুসারেই চলিবে। তুমি বাড়ীতে থাকিয়া কাজকর্ম্ম দেখ, আর আমার যতখানি বিদ্যা আছে, তাহাই তোমাকে দান করিব।”

হরিহর বলিল “ইউনিভারসিটির দুই একটা ছাপ নেবার ইচ্ছা ছিল; তা হয় ত আর হবে না। তা না হোলো, তুমি যা জান দাদা, তাই যদি আমাকে বেশ করে শিখিয়ে দিতে পার, তা হলে আর আমার আক্ষেপ থাক্‌বে না।”

এই সময় ভগবান আর একটা গোলও মিটাইয়া দিলেন। মনোহর বাবুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সকলকেই পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল; সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রীও সেই অসুস্থ শরীরেই কাজকর্ম্মে যোগদান করিয়াছিলেন; রমাসুন্দরী ও মানদার নিষেধ কিছুতেই মানেন নাই। কয়েকদিনের অনিয়মে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন। জেলা হইতে সিবিল সার্জ্জন ও অপর একজন বহুদর্শী বাঙ্গালী চিকিৎসককে আনা হইল। তাঁহারা বলিলেন, রোগিণীর আর বাঁচিবার আশা নাই; এ সময় ঔষধ-পত্র দিয়া তাঁহাকে কষ্ট দেওয়ায় কোনই লাভ নাই। তাঁহারা বাড়ীর সকলকে সর্ব্বদা সতর্কভাবে

শুশ্রূষা করিবার উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। বিলম্বও আর বেশী হইল না; ডাক্তারেরা যেদিন চলিয়া গেলেন, সেই রাত্রিতেই স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া, শাশুড়ীর পদধূলি মস্তকে লইয়া সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী সতীলোকে চলিয়া গেলেন। হরিহর কাঁদিয়া বলিল "দাদা, একে-একে সবাই যে যায়! জ্যেঠাইমা, তুমি যেও না গো, তুমি যেও না।" রমাসুন্দরী হরিহরকে বালকের মত কোলের মধ্যে লইয়া বলিলেন "ভয় কি বাবা, ভগবানের উপর নির্ভর করতে শেখ।"

[১৭]

সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলে একদিন অপরাহ্ণকালে সিদ্ধেশ্বর ও হরিহরকে ডাকিয়া রমাসুন্দরী বলিলেন "একটা বিশেষ পরামর্শের জন্য তোমাদের ডেকেছি। বৌমা ত চলে গেলেন; এখন এ সংসারই বা দেখে কে, হরিহরের সংসারেরই বা ভার নেয় কে? আমি ত বুড়ো হয়ে গেলাম; আজ আছি ক'াল নেই। তোমাদের কি উপায় হবে, সে কথা চিন্তা করেছ কি?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "মা, চিন্তার দায় থেকে আমি একেবারে অব্যাহতি পেয়েছি। কোন দিনই তেমন চিন্তা করি নাই; যা বা একটু আদটুকু সময় সময় ভাবতাম, দুইজনকে ওপারে পাঠিয়ে তাও ছেড়ে দিয়েছি। আমাকে আর কিছু চিন্তা করতে বোলো না।"

রমাসুন্দরী হরিহরের দিকে চাহিয়া বলিলেন "হরিহর, তুমিও তোমার দাদার কথাগুলোই আবার বল; তা হলেই ঠিক হয়।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "আমি যা বল্‌লাম, ওর কি তা বল্‌বার যো আছে। সে কথা ও বেশ বোঝে, ওকে অত বোকা মনে করো না মা!"

হরিহর বলিল "জ্যেঠাইমা, দাদার কথাও মানিনে, আমার কথাও কাউকে মান্‌তে বলিনে; তুমি যা বল্‌বে, আমরা তাই করব।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "তা হলে তুই আমার উপদেশ মত চলবিনে?" হরিহর বলিল "জ্যেঠাইমা, দেখেছ, সরকারের সার্টিফিকেট পেয়ে দাদা একেবারে লাট হয়ে বসেছে। আমি নাবালক কি না, তাই উনি হুকুম দেবেন, খবরদার, আজ নাইতে পাবিনে, আজ মুগের ডাল খেতে পাবিনে, আর অমনি নাবালক সুবোধের মত তাই করব। এই বুঝি তোমার ইচ্ছা দাদা! সে সব হবে না; জ্যেঠাইমা যা বল্‌বেন, তোমাকে তা মাথা পেতে নিতে হবে। তোমাকে যা বল্‌বেন, তা আমি বুঝতেই পেরেছি। বল্‌বেন এই—যা সকল মায়েই বলে থাকেন—বল্‌বেন, যা হবার তা ত হয়ে গেল; সে সব ভেবে চুপ করে বসে থাক্‌লে ত আর সংসার চলে না। এখন লক্ষ্মী ছেলেটির মত আর একটা বিয়ে করে ঘর-সংসার করিতে থাকহ। কেমন জ্যেঠাইমা, এই ত তোমার কথা।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "দেখেছ মা, ওর সঙ্গে কথায় কারও পারবার যো নেই। এই যে এত বড় বিপদটা গেল, এই যে এমন প্রকাণ্ড একটা জমিদারীর ভার স্কন্ধে পড়ল, তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই; সেই সদানন্দ পুরুষই রয়েছে। ওর ছেলেমানুষী কোন দিনই যাবে না।"

হরিহর বলিল "আচ্ছা জ্যেঠাইমা, তুমিই বিচার কর, আমার ছেলেমানুষীটা কোথায় হল। বাবা মারা গেলেন, আমি তার কি করব? আর তিনি যে গেলেন, ভালই গেলেন; নইলে অদৃষ্টে কি হোতো, কে জানে? তার পর, বৌদিদি। তিনি ত আজ কয়

বৎসর মরেই ছিলেন; সুধু কষ্ট পাচ্ছিলেন; তাঁর ত মরা নয়, বাঁচা। তা, সে কথা ভেবে আর কি হবে! তারপর ধর, জ্যেঠাই-মার যা মনের কথা, তা আমি টেনে বার করে দিলাম; তাতেই বা দোষ কি হোলো। হঁ্যা জ্যেঠাই মা, দোষ হয়েছে?"

রমাসুন্দরী বলিলেন "না, তোমার কোন অপরাধ হয় নি। তুমি অমনি সদানন্দ হয়েই বেঁচে থাক; বংশের নাম রাখ। তার পর শোনো সিদ্ধেশ্বর, ও পাগলটা যা বল্‌ল, আমার যে সে ইচ্ছা নয়, এ কথা কেমন করে অস্বীকার করি। যতদিন বৌমা বেঁচে ছিলেন, ততদিন ঐ প্রস্তাব কত জন আমার কাছে করেছিল; তোমার কাকা-বাবু পর্য্যন্ত ঐ কথা বলে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমি কোন কথায় কাণ দিই নাই। তা কি আমি পারি? যাকে আদর করে গৃহলক্ষ্মী করেছিলাম, সে রোগে কাতর বলে তাকে ত মেরে ফেল্‌তে পারিনে। আমি যদি পূর্ব্বে আবার ছেলের বিয়ে দিতাম হরিহর, তা হ'লে আমার বৌমা কি এত দিন বেঁচে থাক্‌তেন। বুকে কি আঘাত পেয়েই মা-লক্ষ্মী আমার চলে যেতেন। আমি কি তা বুঝতে পারিনি। তাই আমি ছেলের পুনরায় বিয়ে দেবার কথা তখন মনেও আনি নাই; বৌমার রোগ নিবারণের জন্য যত চেষ্টা করতে হয়, করেছি। তার পর সময় হয়ে এল; তিনি স্বামীর কোলে মাথা রেখে চ'লে গেলেন। কি করব বল? চেষ্টা যত্নের কিছুই ক্রটী করি নাই। অদৃষ্ট মন্দ, কিছুই হোলো না। এই সেদিন তিনি চলে গেছেন, আর আজই যে আমি সিধুকে বলি, বাবা আর একটা বিয়ে কর, এমন হৃদয়হীন মা

আমাকে পাও নি বাপ হরিহর! অথচ ঐ কথাটা যে আমার মনে জাগ্‌ছে, তাই বা অস্বীকার করি কি ব'লে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সিধু, তুমি নিজের সম্বন্ধে কি স্থির করেছ? আমার মুখের দিকে চেয়ো না, হরিহরের কথা ভেবো না; তোমার জীবনের শান্তির জন্য তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করা স্থির করেছ, তাই আমাকে মন খুলে বল। তাই শুনে, তবে আমি সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারি।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "মা, এখনই কি তোমার ব্যবস্থার সময় এসে পড়েছে? যাক্ না কিছুদিন; তার পর যা হয় করা যাবে।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "কাহারও শরীরের কথা বলা যায় না। এই ত, একেবারে সুস্থ মানুষ তোমার কাকা-বাবু, এক নিমিষের ভরও সইল না।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "অবশ্য আমি যে মনে কিছু স্থির করি নাই, তা নয়; এবং আমি যা সঙ্কল্প করেছি, তুমি তাতে নিশ্চয়ই সম্মত হবে—কারণ তুমি যে আমার মা। তোমার হৃদয়ের সমস্ত ভাব আমি বুঝতে পারি। তবুও সময় নিচ্ছিলাম কেন, তা জান। এই হরিহরের এখন কালাশৌচ, তারপর এখনও সে আইন হিসাবে নাবালক। কালাশৌচ শেষ হয়ে যাক, ও সাবালক হয়ে বিষয় হাতে করুক, তার পর আমি যা কর্ত্তব্য স্থির করে রেখেছি, সেই অনুসারে কাজ করব। তারই জন্য বিলম্ব করছি, নতুবা আমি যে মনে কিছুই এখন পর্য্যন্ত ভাবি নাই, তা নয়।"

হরিহর বলিল "তা যদি ভেবে-চিন্তে সবই ঠিক করে থাক, তার

জন্য আমার কালাশৌচেই বা তোমার কি বাধল, আমার বিষয়ের মালিক না হওয়া পর্য্যন্তই বা কি আট্‌কে গেল। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করবে, তার মধ্যে আমাকে জড়াও কেন?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "তোকে জড়াবার জন্যই এখন চুপ করে থাক্‌তে চাই, সময়ের অপেক্ষা করতে চাই।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "না, যা তোমার মনের কথা, আমাকে খুলেই বল না; সেই হিসাবে এখন থেকেই সব ঠিক করা যাক্। আমি, সিধু, তোমাকে কোন অনুরোধ করব না, কারণ তোমার উপর আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি। তুমি নিঃসঙ্কোচে তোমার মনের কথা বল্‌তে পার।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "তা হ'লে মা, এখনই শুনবে? বেশ, তা হোলে শোনো। আমি যে আবার বিবাহ করে সংসার-ধর্ম্ম করব, সে ইচ্ছা আমার নাই। সে বিষয়ে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সিদ্ধেশ্বর নীরব হইলেন।

হরিহর বলিল "তার পর কি, তাই বল? চুপ করলে কেন?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "তার পরের কথা বল্‌বার আগে মায়ের অনুমতি চাই হরিহর! আর তোমার কাছেও একটা কথা চাই।"

হরিহর বলিল "জ্যেঠাইমা ত তোমার উপরই সব ভার দিয়েছেন; তুমি যা করবে তাতেই ওঁর সম্মতি আছে।"

"তবুও মা, তোমাকে বল্‌তে হচ্ছে, আমি তোমার কাছে যা ভিক্ষা চাইব, তাই তুমি আমাকে দেবে।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "তুই আজ এ কি নূতন কথা বল্‌ছিস্।

তোকে অদেয় কি আমার কিছু আছে? তুই কি আমার তেমন ছেলে! তোকে আমার কাছে ভিক্ষা করতে হবে কেন? তোর যা প্রার্থনা, তা আমার কাছ থেকে তুই জোর করে, আবদার করে আদায় করে নিবি।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "তা জানি মা! তবুও সব দিক বেঁধে নিচ্ছি। তার পর, ভাই হরিহর, আমি যা বল্‌ব, তাতেই তুমি রাজী হবে?"

হরিহর বলিল "একটা বাদে সব-তাতেই রাজী। তুমি যা বল্‌বে, তার সব শুন্‌ব, সুধু একটা কথা শুন্‌ব না। সে কথাটা আগেই বলে রাখি। তুমি যে বল্‌বে, তোমার বিষয়-সম্পত্তি আমাকে লেখাপড়া করে দেবে, তা আমি শুন্‌ব না; তা ছাড়া আর যা বল্‌বে, আমি তাই করব, তোমাকে বল্‌ছি।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "বেশ, আমার বিষয় তুই নিস্‌নে, আমি তা তোকে দিতেও যাচ্ছিনে; আমার খুড়তুতো ভাইকে আমি বিষয় দান করব, এও কি একটা কথা রে!"

হরিহর বলিল "বেশ, তাই না হলেই হোলো।"

সিদ্ধেশ্বর তখন বলিলেন "মা, আমি তোমার কাছে সুহার মেয়েটীকে ভিক্ষা চাচ্ছি। আর ভাই হরিহর, আমার এই সুহারকে তোমাকে বিবাহ করতে হবে। দেবীপুরের জমিদারেরা যে গোরাচাঁদ মুখুয্যের নিরপরাধা বিধবাকে সমাজের দিকে না চেয়ে, সুধু আশ্রয় দিয়েছে, তাই নয়; গোরাচাঁদ মুখুয্যের কন্যাকে দেবীপুরের জমিদার গৃহলক্ষ্মী করেছে, এইটে আমি দেখাতে চাই।

কেমন হরিহর, তুমি এতে সম্মত আছ ? কেমন মা, তুমি সুহারকে ভিক্ষা দেবে ?"

রমাসুন্দরী বলিলেন "বাবা সিদ্ধেশ্বর, তোকে আমি সার্থক পেটে ধরেছিলাম। আজ তোর কথা শুনে আমার প্রাণ শীতল হয়ে গেল। আমি সুহারের বিবাহের কথা কত চিন্তা করেছি। কি যে করব, তা ভেবে পাইনি। বার বছরের মেয়ে। তুই যা স্থির করেছিস্ সধু, তার চাইতে সুহারের সৌভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে ? পারবি বাবা হরিহর, সুহারকে বিয়ে করতে ? সমাজে কিন্তু গোল হবে, সে কথা বলে রাখছি।"

হরিহর বলিল "দাদা যে এমন কথা বল্‌বে, এ আমি মোটেই ভাবিনি জ্যেঠাইমা! কিন্তু, আমি ত কথা দিয়েছি, দাদা আমাকে যা বল্‌বে, আমি তাই করব।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "দেখ হরিহর, আমি এই এতদিন সুহারকে দেখে আস্‌ছি! কি যে সুন্দর মেয়ে! রূপের কথা বল্‌ছিনে, তুই ত তাকে দেখেছিসই ; আমি গুণের কথা বলছি। এমন মেয়ে আমার চোখে বড় কম পড়েছে। তুই সুখী হবি হরিহর, এ ভবিষ্যদ্‌বাণী আমি করছি। দেখ মা, হরিহরের কালাশৌচ না গেলে ত বিবাহ হতে পারে না ; তাই আমি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলাম।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "কালাশৌচ অবস্থাতেও বিবাহের বিধান আছে ; বিবাহের পূর্ব্বে সমস্ত সপিণ্ডকরণ শেষ করলে আর বিবাহে বাধা হয় না ; বিশেষ কন্যা যদি অরক্ষণীয়া হয়।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "আমি কিন্তু এ ব্যবস্থাটা জানতাম না মা!"

হরিহর বলিল "আর কিছু তোমার বল্‌বার নেই দাদা!"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "এখনও আমার কথা শেষ হয় নাই। সুহারের বিবাহ দিয়া আমি এই নয়-আনির জমিদারী যৌতুক দেব। তারপর মা ও সুহারের মাকে নিয়ে আমি কাশী-বাসী হব। হরিহর আমাদের মাসিক যৎকিঞ্চিৎ খরচ পাঠিয়ে দেবে।"

হরিহর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল "এ কক্‌খনো হবে না। আমি ত বলেছি দাদা, তোমার জমিদারী আমি নেবো না; আর সব কথা শুন্‌বো। তুমি বিবাহ করতে বলচ, আমি তাতে সম্মত, কিন্তু বিষয় নেব না।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "আমি ত বলেছি, আমার ভাইকে আমি বিষয় দেব না। আমি ত তোকে কিছুই দিচ্ছিনে; যে সুহারকে বিবাহ করবে, আমি তাকেই আমার জমিদারী যৌতুক দেব। তুই বিবাহ করতে অস্বীকার করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিস্‌, তুই বিষয় পাবি নে। আমি সুহারের ভাবী স্বামীকেই আমার সম্পত্তি দান করছি, আমার কাকা-বাবুর ছেলে অর্বাচীন হরিহর চট্টোপাধ্যায়কে দিচ্ছিনে: কেমন, আমার কথা বুঝলি। যা, আর কথা বলিস্‌ না; আমি যা বল্‌ব, তাই তোকে মেনে নিতে হবে। তোকে যে জিজ্ঞাসা করেছি, এই তোর সৌভাগ্য, বুঝলি!"

রমাসুন্দরী বসিয়া ছিলেন; উঠিয়া বলিলেন "তোরা একটু

অপেক্ষা কর্, আমি এখনই আস্‌ছি।” এই বলিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

হরিহর বলিল “দাদা, তুমি যে এমন করবে, তা আমি কিন্তু মোটেই ভেবে উঠ্‌তে পারি নি। দেখ, সমাজের ভয় আমি করিনে; সে কথা ত তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম। আরও বলেছিলাম যে, যে ব্যাপার নিয়ে তুমি সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে দাঁড়িয়েছ, আমি তাতে সাহায্য করতে চাই। তুমি আমাকে সেই ভার আজ দিলে। অন্য কারণেও না হোক,সামাজিক কারণেই আমি এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত দিচ্ছি। একটা দলাদলি হবে। তা হোক্ না। আমরা সত্যি-সত্যিই একঘরে হব না। এবার কল্‌কাতায় গিয়ে এ সম্বন্ধে আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। যাঁরা শিক্ষিত, তাঁরা সকলেই আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন। সেজন্য তুমি ভেবো না। জমিদারী নিয়ে ত আর দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবে না; এখন কিছুদিন দলাদলিই করা যাক্।”

সেই সময় রমাসুন্দরী মানদাকে লইয়া সেই ঘরে আসিয়া বলিলেন “মানদা, তোকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করলেও হোতো; তবুও তুই সুহারকে গর্ভে ধরেছিস্, তাই তোকে বল্‌তে হয়। তুই ত মেয়ে-মেয়ে করে ভেবেই অস্থির হয়েছিলি; আমাকেও ভাবিয়ে তুলেছিলি। তুই ত বলেছিলি যে, কোন ব্রাহ্মণ-সন্তানই তোর মেয়েকে বিবাহ করে পতিত হতে স্বীকার করবে না। সিধু তোর মেয়ের জন্য বর ঠিক করেছে। ব্রাহ্মণের ছেলে—তাতে তোর কোন ভয় নেই।”

মানদা অতি সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন "এ কি সম্ভব হবে। আমার মত হতভাগিনীর মেয়ের কি বিবাহ হতে পারে? আমি যে সে আশাই ত্যাগ করেছি। তুমি দিদি, আশ্রয় দিলে, তাই বেঁচে গেলাম; নইলে এতদিনে কোথায় ভেসে যেতাম, তা মনে হলেও ভয় হয়। সুহার যে দুবেলা দুটো খেতে পাচ্ছে, এই ওর সৌভাগ্য! তার বাড়া আশা করতে আমার সাহস হয় না দিদি! সমাজে ত আমাদের স্থান নেই। তোমরাই জোর করে আমাদের আশ্রয় দিয়ে নানা বিপদ ডেকে এনেছ।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "সুধু আশ্রয় নয়, সিধু ভাল বর ঠিক করেছে। সে বরের কোন ক্রুটী নেই। এই হরিহরের সঙ্গেই আমরা সুহারের বিবাহ দেব, ঠিক করেছি। কেমন, দেবীপুরের চাটুয্যেদের ঘরে মেয়ে দিতে তোর কোন আপত্তি আছে?"

মানদা নিজের কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, বলিলেন "দিদি, তুমি এ কি বল্‌ছ? এ তামাসা কেন?"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "না, তামাসা নয়; হরিহর সুহারকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে।"

মানদা রমাসুন্দরীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। রমাসুন্দরী পা ছাড়াইয়া লইয়া মানদাকে ধরিয়া তুলিলেন; বলিলেন "কাঁদছিস্ কেন মানদা!"

মানদার তখন কথা ফুটিল। তিনি বলিলেন "আমি যে এ কথা বিশ্বাস করতে পারছিনে। সুহারের যে এমন অদৃষ্ট হবে, তা কি করে বিশ্বাস করব দিদি!"

রমাসুন্দরী বলিলেন "ভগবান যা করেন, তাই হয়। তাঁরই দয়ায় এই অঘটনও ঘটিয়া গেল।"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "মা, তুমি বল্‌ছ বটে যে, এক বৎসরের মধ্যেই সপিণ্ডকরণ শেষ করে বিবাহ হতে পারে। কিন্তু, তা কাজ নেই। বছরটা কেটেই যাক্। হরিহর তখন বিষয়ের দখল পাবে। সেই সময় বিবাহ দিলেই হবে। তবে তোমাদের কাশী যাওয়ার একটু বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। তা অমনিও হোতো। হরিহরের সম্পত্তি বুঝিয়ে না দিয়ে ত আমার অব্যাহতি নেই।"

মানদা বলিলেন "দিদি, কাশী যাওয়া কি? আমি ত বুঝতে পারলাম না।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "আমাদের কাজ ত সুহারের বিয়ে হয়ে গেলেই শেষ হয়ে যাবে। তখন আর আমরা দেশে থেকে কি করব? সিধু সংসার-ধর্ম্ম করবে না; আমিও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করব না। তুই আর আমি কাশীতে যাব; সিধুও সেখানে আমাদেরই কাছে থাক্‌বে। জমিদারী রইল, আর হরিহর-সুহার রইল।"

মানদা বলিলেন "সে কি ভাল ব্যবস্থা হোলো?"

রমাসুন্দরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ভাল-মন্দের কর্ত্তা কি আমরা! যিনি কর্ত্তা, তিনি যা করবেন, তা করতেই হবে। তাঁর বিধান কি কেউ খণ্ডন করতে পারে?"

মানদা তবুও বলিলেন "এই বয়সে কি কেউ সংসার ত্যাগ করে?"

রমাসুন্দরী বলিলেন "এর থেকেও কম বয়সে বুদ্ধদেব, চৈতন্য-দেব সংসার ত্যাগ করেছিলেন। সিধু যদি সত্যিসত্যি সে পথ নিতে পারে, তা হলে আমাদের বংশ পবিত্র হয়ে যাবে।"

মানদা বলিলেন "দিদি! তুমিই ধন্য! অনেক ছেলের সন্ন্যাসের কথা শুনেছি, পড়েছিও; সকলেই গোপনে সংসার ত্যাগ করেছিলেন; এমন যে বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব তাঁদেরও রাত্রিকালে চুপে চুপে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু, তুমি কি করছ দিদি! তুমি নিজ হাতে ছেলেকে সন্ন্যাসী সাজিয়ে দিচ্ছ। এ কখন দেখি নাই। এমন মা না হলে কি এমন ছেলে হয়।"

রমাসুন্দরী বলিলেন "শোন্ মানদা, আমি ছেলেকে সন্ন্যাসী সাজিয়ে দিচ্ছিনে; ভগবান সাজিয়ে দিয়েছেন। তোর আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে যে, আমি সিদ্ধেশ্বরকে আবার বিবাহ করবার আদেশ দিলাম না কেন? আমি তা পারি না। স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুতে চির-বৈধব্য গ্রহণ করবে, ইহা আমাদের শাস্ত্রের বিধান; আমি সে বিধান মানি; এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও আমি মানি যে, বাল-বিধবার পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিত। যে মেয়ে স্বামী কি, তা চিন্‌ল না, তার পুনরায় বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। আমি স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে যা মানি, পুরুষের সম্বন্ধেও তাই মানি মানদা! আমার ছেলের বয়স যদি আজ পনর বৎসর হোতো, আমার বৌমা যদি দশ বছরে মারা যেতেন, আমি ছেলেকে পুনরায় বিবাহ দিতাম; কিন্তু, তা ত হয় নাই। আমার সিধুর বয়স হয়েছে; সে স্ত্রী কি, তা জেনেছিল; স্বামী-স্ত্রীতে অনেকদিন গৃহস্থ-ধর্ম্ম পালন

করেছে। এখন বৌমা মারা গেলেন, আর আমার ছেলে পুনরায় বিবাহ করবে? তা হ'তেই পারে না। তাকেও চিরদিন বিপত্নীক থাকতে হবে। এই আমি বলি। শাস্ত্র যাহাই বলুক, সকলের উপরে আর এক শাস্ত্র আছে; সে শাস্ত্রের বিধান—দাম্পত্য-বন্ধন কখন ছিন্ন হয় না। স্বামীর মূর্ত্তি পূজা করে বিধবা যেমন জীবন কাটাবে, স্ত্রীর মূর্ত্তি পূজা করেও বিপত্নীককে তেমনি জীবন কাটাতে হবে। সেই জন্যই আমি সিদ্ধেশ্বরকে সন্ন্যাসী সাজাচ্ছি।"

বাঙ্গালী মায়ের মুখনিঃসৃত এমন কথা কেহ কোন দিন শোনে নাই। হরিহর রমাসুন্দরীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল "আর তোমাকে জ্যেঠাইমা বল্‌ব না, তুমি শাপভ্রষ্টা দেবী! আমরা ধন্য যে, তোমাকে এতদিন বেঁধে রেখেছিলাম, কিন্তু তোমাকে চিন্‌তে পারিনি মঙ্গলময়ী! জগদ্ধাত্রী!"

সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "হরিহর, আমি জানতাম না যে, আমার মায়ের ভিতর এমন মহাশক্তি রয়েছে। আজ তোমার উপলক্ষে মা আমার আর এক মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। সত্যসত্যই আজ আমি ধন্য হয়ে গেলাম হরিহর!"

সকলেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর সিদ্ধেশ্বর বলিলেন "হরিহরের সহিত সুহারের বিবাহ যখন এক বৎসর পরে হবে, তখন এ কথা এখন আর রাষ্ট্র করে কাজ নেই। বিবাহের সময়কালে সমস্ত প্রকাশ করলেই হবে।"

তাহাই স্থির হইল। হরিহর ও সুহারের শিক্ষার ভার সিদ্ধেশ্বর

গ্রহণ করিলেন, এ দিকে রমাসুন্দরী জমিদারী সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই হরিহরকে শিখাইতে লাগিলেন।

*   *   *   *   *

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল! হরিহর জমিদারীর ভার পাইল; পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ মহা সমারোহে সম্পন্ন করিল। তাহার পরই প্রচারিত হইল যে সুহাবের সহিত হরিহরের বিবাহ আর একমাস পরেই হইবে। সিদ্ধেশ্বর এই বিবাহ উপলক্ষে দেশের প্রধান-প্রধান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এ দিকে অন্য আয়োজনও চলিতে লাগিল। এই বিবাহের যে সামাজিক প্রতিবন্ধক আছে, সিদ্ধেশ্বর তাহা গোপন করিলেন না। নিমন্ত্রণ-পত্রের সহিত আরও একখানি ক্রোড়-পত্র দেওয়া হইল; তাহাতে কন্যার মায়ের সম্বন্ধে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ হইল। সিদ্ধেশ্বর এই নিমন্ত্রণ-পত্র ডাকে পাঠাইলেন না; একজন প্রধান ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে পত্রসহ দেশের প্রধান-প্রধান পণ্ডিতদের নিকট প্রেরণ করিলেন; এবং তাঁহারা যাহাতে বিবাহে যোগদান করেন, সে সম্বন্ধেও বিশেষ অনুরোধ জানাইলেন।

বিবাহের দিন সমাগত হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মধ্যে দুই চারিজন ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত হইলেন। সিদ্ধেশ্বর জানিতেন যে, এ কার্য্য সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে না—হইতে পারে না। তবুও অনেক পণ্ডিত, অনেক সমাজপতি যে পদধূলি দান করিয়াছেন, ইহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। হরিহরের বন্ধুগণ দল বাঁধিয়া এই বিবাহক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; যাঁহাদের অভিভাবকেরা এই

বিবাহে যোগদানে সাহসী হন নাই, তাঁহাদের পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয় বা জামাতা প্রকাশ্য ভাবে এই বিবাহে যোগদান করিলেন। দেশের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। বিপক্ষ দলও এই কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু, দেবীপুর অঞ্চলে সিদ্ধেশ্বর হরিহরের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী জমিদার আর ছিল না; কাজেই বিপক্ষ দলের চেষ্টায় শুভকার্য্যের কোন অঙ্গহানি হইল না।

বিবাহের দিন অপরাহ্ণ-কালে পণ্ডিতমণ্ডলীর এক সভা হইল। অনেক আলোচনা, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, যে বালিকার সহিত হরিহরের বিবাহ হইতেছে, সে বালিকার জন্মের বার বৎসর পরে যখন এই অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে, তখন বালিকার কোন অপরাধই হয় নাই। তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে যে সাধ্বী দুর্ব্বলের অত্যাচারে এই ভাবে নিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাকে সমাজে গ্রহণ করা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিভিন্ন বিধান আছে; কিন্তু ন্যায় ও যুক্তি এই নিরপরাধার সপক্ষেই মত দিবে। ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইয়া গেল। দেশের অনেক ব্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন; পণ্ডিতগণও যথাযোগ্য বিদায় ও পাথেয় পাইয়া বর-কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। একজন প্রধান পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বরকে বলিলেন "বাবা, সমাজে এ সকল চালাইয়া লওয়া অতীব কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, আমাদের সে বল নাই, প্রকৃত

কথা বলিবার সাহসও নাই। তোমরা যুবক, তোমরা ধনী, তোমরা সাহস করিয়া এই সকল চালাইতে আরম্ভ কর; দেখিবে ধীরে ধীরে সমস্ত বাধা দূর হইয়া যাইবে।"

বিবাহের পরদিন যখন নয়-আনির বাড়ী হইতে বর-কন্যা বিদায় হইয়া সাত আনিতে যাইবে, সেই সময় সিদ্ধেশ্বর অগ্রসর হইয়া হরিহরের হস্তে একখানি দলিল দিয়া বলিলেন "হরিহর, এই আমার দানপত্র। আমি আজ নয়-আনি সাত আনি এক করিয়া দিলাম। মনে আছে ভাই হরিহর, এক দিন তুমি বলেছিলে, কি করলে নয়-আনি সাত-আনি মিলে যায়। সেদিন আমি আর এক রকমের কথা বলেছিলাম। আজ সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে, আমার ইচ্ছা সফল হোলো;—আজ তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি—আমাদের জমিদারী যেমন আজ মিলিত হয়ে 'ষোল আনি' হোলো—তেমনি তোমরাও মিলিত হয়ে একেবারে ষোল আনা হয়ে যাও।"

বরকন্যা সিদ্ধেশ্বরের পদধূলি গ্রহণ করিল। চারিদিক মঙ্গল ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। সিদ্ধেশ্বর স্থির ভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই শোভাযাত্রা দেখিতে লাগিলেন। বর কন্যা প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলে সিদ্ধেশ্বর দেখিলেন তাঁহার মাতা অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন। সিদ্ধেশ্বর দ্রুতপদে মায়ের সম্মুখীন হইলেন এবং নতজানু হইয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া বলিলেন "মা, আজ আমাদের কার্য্য শেষ, আজ যে আমাদের

'ষোল-আনি'।